প্রিয় প্রসঙ্গ।

বা

হারাণো প্রণয়।

"ও কে গো কাতরস্বরে আন্‌-মনে গান করে
একাকিনী বিষাদিনী চেয়ে নদী পানে!
ওরো কি আমারি মত হৃদি-রাজ্য বজ্রাহত!
ফোটে না কুসুম আর সাধের বাগানে!"
—বিহারি লাল চক্রবর্ত্তী।

কোন বঙ্গমহিলা প্রণীত।

এস্‌ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং
দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত।

হেয়ার প্রেস।

৫৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট আম হাউসের নিজ দক্ষিণ।

১৮৮৪।

সূচীপত্র।

প্রিয় প্রসঙ্গ।

দুর্গোৎসব।

মা! আমি শ্রীচরণে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। তুমি জগজ্জননী, অধমতারিণী, আনন্দময়ী তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। মা! চিরকালই তোমাকে বড় ভালবাসি। ছেলেবেলা তোমার আসিবার আহ্লাদে মাস গণিয়া দিন গণিয়া কাটাইতাম। তুমি এলে নূতন কাপড় হইবে, বাবা কত আদর করিবেন, দাদা বাড়ী আসিবেন, রাত্রি দিন ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজনা বাজিবে, মেষ মহিষ বলি হইবে, সই সব সাথীদের সঙ্গে গলাগলি হইয়া চণ্ডীমণ্ডপে পূজা দেখিতে যাইব, তুমি, আমার কৌমারের আনন্দময় সেই দুর্গা! তারপরে আর এক রকম আহ্লাদ, শ্বশুর বাড়ী থাকিতে হয়, ভাল কাপড় ভাল গয়না পরিতে হয়, কত দিনের পর আত্মীয়

স্বজনদিগকে দেখিতে পাই; আর মা—কিছু মনে করিওনা মা ! আভরণের যে আভরণ আমোদের যে আমোদ, পূজার যে উৎসব, তোমার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে তাঁহাকেই পাইয়া ছিলাম। মায়েতেই মা, মেয়ের ভাব বোঝে-সেই জন্যেই ভাদ্র মাস থেকে রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। আর আজ পয়লা, আজ দোসরা এইরূপ করিয়া দিন কাটাই। সেই জন্যেই মা, তোমায় অত ভাল বাসি—তুমি আমার মনোবাঞ্ছা-পূর্ণ-কারিণী, তাই তোমায় অত ভালবাসি। মা ! তুমি সেই আনন্দময়ী আসিয়াছ, তবে আমার এ নিরানন্দ কেন? দুই চক্ষু পুরিয়া জল আসিতেছে কেন? তোমাকে দেখিয়া বুকের ভিতর অমন করিতেছে কেন ! আমার কি হইয়াছে? আমার কি নাই মা? আমি কি হারাইয়া কাঁদি মা? একবার বল না মা? বাক্স পোরা গয়না পড়িয়া আছে আর গায় দিতে পাইবনা, তাই বলিয়া কাঁদি? না, মা, অত ভাল কাপড় পড়িয়া আছে পরিতে পাইব না, তাইতে কাঁদি? না, মা, আর এজন্মে চুল বাঁধিতে

পাইব না, আল্‌তা পরিতে পাইব না চুড়ী পরিতে পাইব না, সেই সব ক্ষোভে কাঁদি? না মা, সে সব ক্ষোভে কাঁদিতাম, যদি তার চেয়ে শতগুণ বড়—অসঙ্খ্যগুণ বড় আর এক দুঃখ না হইত! কি জানি, ঐ যে, কি জানি ঐ যে--ঐ যে আমার কি হইয়াছে, কি জানি মা, বল্‌তে গেলে বল্‌তে পারিনা যে মা, আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ঐ যে সিঁদুর টুকু আর পরিতে পাইবনা সেই বড় ক্ষোভ হইয়াছে। আর মা! অলঙ্কারের যে অলঙ্কার, বেশ বিন্যাসের যে বেশ বিন্যাস, সিঁদুরের সিঁদুর, দুর্গোৎসবের যে দুর্গোৎসব তাই যে হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই যে আমার কপাল পুড়িয়াছে তাতেই আমি কাঙ্গালিনী হইয়াছি।

এই কি আশ্বিন মাস? এ কি প্রকার আশ্বিন মাস মা? এ কেমন দুর্গোৎসব? পূজায় সে উৎসাহ কই? বাড়ীতে সে আমোদ কই? বাদ্যে সে উৎসব কই? সঙ্গীতে সে মোহিনী শক্তি কই? তুমি সে আনন্দময়ী কই? পূজা পূজা ঠেকিতেছে

কই? আমার সে বেশভূষা কই? মনের সে 'ধরেনা' 'ধরেনা' সুখ টুকু কই? আমার সে আদর কই? সেই মনোমোহন গল্প গুলি কই? সেই জীবন যুড়ানো মুখখানি কই? সেই ভুবন-ভুলানো হাসি রাসি কই? সে সব নূতন নূতন সকের জিনিস কই?—আর মা, এত সকল যাঁহার জন্যে হয় সেই সকল্লের সকল তিনি কই? ওমা! এক বার বল না মা? পায় পড়ি মা, একবার বল। সে সব কি হ'ল মা? আমার সে সব কি হ'ল মা? সে সব কোথায় আছে? তুমি জগদীশ্বরী, দেব-বালা তুমি সকল কথাই জান। আমার কাছে একবার বল। তুমি জগজ্জননী, একবার আমার মায়ের কাজ কর, একবার কাঙ্গালিনী বলে মুখ তুলে চাও।

সে বুঝি আমার ভুল! তা তুমি চাহিবে কেন? তুমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, আমি ক্ষুদ্রকীট, আমার কথা তুমি শুনিবে কেন? মা গো! আজ তুমি আমাকে কাঙ্গালিনী ভাবিয়া ঘৃণা করিতেছ, কিন্তু এই আমি এক দিন রাজরাণী ছিলাম! রাজ-

রাণী ছিলাম? রাজরাণী ছিলাম বই কি? কোন দেশ বা মহাদেশের রাণী ছিলাম না, একজনের হৃদয় রাজ্যে একমাত্র অধীশ্বরী ছিলাম। তখন আমার মনের ভাব রাজরাণীর মতন ছিল— রাজরাণীর মতন সুখী ছিলাম। সেই একজনের উপর আমার প্রভুত্ব চলিত। আমি ইচ্ছা-মত তাঁহাকে হাসাইতে কাঁদাইতে রাগাইতে আদর করাইতে পারিতাম। সেই আদরে—কেবল তাঁরই আদরে জগতের আদরিণী ছিলাম, সে এক দিন, আর এ এক দিন! সেই আমি তোমার কাছে এত কাঁদিতেছি, তুমি একবার শুনিতেছ না? তুমি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আমি কাঙ্গালিনী, তুমি ভাগ্যবতী আমি হতভাগিনী, তুমি দেবী আমি মানবী, আমার দুঃখ তুমি বুঝিবে কেন? দেবতার মন কি নিষ্ঠুর মা? দেবতার বুক কি পাষাণে গড়া? জগদীশ্বর নামে নাকি এক দেবতা আছেন, তিনি নাকি আমার এই সর্ব্বনাশ করেছেন! আবার নাকি বিধাতা-পুরুষ নামে এক দেবতা আছেন এত দুঃখ তিনি নাকি আমার কপালে

লিখিয়াছেন! দেবতায় তবে কেমন করে ভক্তি হবে মা? তুমি কি দেববালা? হ্যাঁ মা! তুমি কি দেববালা? তা ও ত দেখতে পাচ্ছি! মা! তোমার কাছে এত করিয়া কাঁদিলাম, তোমার চক্ষে এক ফোঁটা জল এল না! এতক্ষণ যদি মায়ের কাছে কাঁদিতাম, তাহাহইলে মা কত কাঁদিতেন, এতক্ষণ যদি দাদার কাছে কাঁদিতাম, তাহা হইলে তিনি কত বুঝাইতেন, এতক্ষণ যদি সম দুঃখিনীদের কাছে কাঁদিতাম তাহারা আমার সঙ্গে কত কাঁদিত। আর মা, যদি—যদি যাহাঁর জন্যে একষ্ট, এ যমযন্ত্রণা পাইতেছি, তিনি যদি দেখিতেন, তাহা হইলে দেখিতে, এই কাঙ্গালিনীর সোহাগ দেখিতে, প্রণয়ের কত দূর ক্ষমতা বুঝিতে, মানুষের ভালবাসা জিনিসটা কি জানিতে। আর আমি—আমি যে কেমন কাঙ্গালিনী আমি যে কিসেরকাঙ্গালিনী তাহা জানিতে পারিতে। মা তুমি দেবীই হও, ভাগ্যবতীই হও আর ব্রাহ্মাণ্ডেশ্বরীই হও, তাহা হইলে আমার অদৃষ্ট কে ধন্যবাদ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে

আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে! তা ত কিছুই হ'লনা, তবে আমার দুঃখ তুমি বুঝিবে কেন? একান্নায় তোমার মন ভিজিবে কেন? তুমি অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ডেশ্বরী আমি অনন্ত দুঃখিনী, তবে আমার কান্নায় তোমার মন ভিজিবে কেন?

হয়ত, মা! এই সকল কথা শুনিয়া আমাকে কত নির্লজ্জা ভাবিতেছ, তা তুমি ভাবিতে পার। আমার সকল লজ্জা হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন আর লজ্জা নাই—তবু আছে, মনের সকল কথা কখন বলিতে পারিনা। ওমা! তাতেইত কাঁদি, তাতেইত এত জ্বালা! মনের কথা লোকের কাছে খুলিয়া বলিলে মন কতক শান্তি পায়, তা যে বলিবার যো নাই, কে যেন বাক্‌শক্তি হরণ করিয়াছে, মনের কথা মন বলিতে দেয়না, কেবল বুকই ফাটিয়া যায়!

(তবু কি আমাকে নির্লজ্জা ভাবিবে মা! তাহা ভাবিলে আর কি করিব? কিন্তু মা, আমি চিরকাল এরূপ নির্লজ্জা ছিলাম না এক সময়ে আমার কত লজ্জা ছিল—আপনা আপনি বলি-

তেছি বলিয়া না জানি আবার কি মনে করিবে। যথার্থ বলিতেছি মা, সেই পোড়া লজ্জার জন্যেইত এত কষ্ট পাইতেছি, পোড়া লজ্জার জন্যেইত জন্মের শোধ চক্ষের দেখাও হয় নাই, পোড়া লজ্জার জন্যেই আমার সব হইল। গুরুজনদিগের মুখে তাঁহার কোন কথা শুনিলে কখন উত্তর করি নাই। সমস্ত দিনের মধ্যে এক বারও তাঁহার নিকটে যাই নাই—তোমার কাছে বলিতে কি মা, এখানে কেও নাই। তিনি ঘরে থাকিলে আমি প্রায় সমস্ত ক্ষণ তাঁহার কাছে থাকিতাম। তিনি কেমন করিয়া ডাকিতেন, তাহা কেবল আমিই বুঝিতাম। যখন তাঁহার নিকটে যাইতাম, চুড়ী আঁটিয়া মল খুলিয়া চাবি ধরিয়া যাইতাম—পাছে কেউ জানিতে পায়, এই ভরে কত সাবধান হইতাম, তবু যে মা এ কি পোড়া মন, ঐযে চুড়ী বাজিল, ঐ চাবি নড়িল, ঐ পায়ের শব্দ হইল, ঐ দরজা খট্ খট্ করিয়া উঠিল এই মনে করিতাম। তিনি কত বুঝাইতেন, কিন্তু মা, এ যে কি পোড়া মন,

কিছুতেই কিছু হইত না। কিন্তু, তাঁহাকে লজ্জা করিতাম না—সত্য কথা বলিতে দোষ কি, তুমিত আর কার ও কাছে বলিতে যাইতেছ না, আমার ইচ্ছা হইত যে তাঁহাকে কিছু মাত্র লজ্জা করিব না, কিন্তু মা, পোড়ামোনের যে কত দোষ, সে ইচ্ছামত কার্য্য হইত না। তিনি কত আদর করিয়াছেন, কত মনের কথা বলিয়াছেন, আমি কিছুই পারি নাই; আবার মা, তাঁহাকে লজ্জা করিত। তিনি সে সমস্ত ভাবই বুঝিতে পারিতেন। যখন আমার স্বভাবের বিষয় সম্পুর্ণ বর্ণনা করিয়া কহিতেন, তখন যে কত সুখে সুখী হইতাম, লজ্জা মাথা লজ্জা মাথা কেমন কেমন সুখ, এমন নাই এমন নাই সেই যে কেমন সুখ, সেই সুখের জন্যেই কাঁদি মা। (সেই—আমার সুখের যে সুখ, সৌভাগ্যের সৌভাগ্য, প্রণয়ের যে প্রণয়ী তাঁর জন্যেই কাঁদি মা)

আর একটা কথা মনে পড়িয়াছে মা, তাঁহাকে সমস্ত রাত্রে দেখিতাম, দিনের বেলায়

কত দেখিতাম, দর্শনেচ্ছা বৃদ্ধি বই হ্রাস হইত না। ঐ আমার বড় দোষ ছিল, দেখিয়া এজন্মে সাধ মিটিল না! সে শুধু আমার দোষ বলেও নয়, স মুখে কি ছিল, যখনই দেখিতাম, তখনই নূতন বলিয়া মনে হইত। সেই মুখের সেই আদর, সেই সকল প্রণয় পূর্ণ বাক্য, যখন শুনিতাম তখন একেবারে গলিয়া যাইতাম। চিরকাল দাসী হইয়া থাকিব সাধ করিতাম! চক্ষের ভিতর পুরিয়া রাখিব, কতবার ভাবিতাম! অত কথা তিনি কোথায় শিখিয়া ছিলেন মা? সেই মুখ বিধাতা কেমন করিয়া গড়িয়া ছিল মা? যে দেখেছে সেই কেন কাঁদে মা? জগদীশ্বর একাধারে রূপ, গুণ, বিদ্যাবুদ্ধি, শিষ্টতা, শীলতা প্রভৃতি সব, অত জানিনা এত সব কেন! সৃজন করিলেন? যদি সৃজন করিয়াছিলেন, তবে এত শীঘ্র লয় করিলেন কেন? যদি সৃজন পালন লয় ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয়, তবে এমন করিয়া আমাকে ভালবাসাইলেন কেন? আমার প্রাণের ভিতর রাখিয়া আর এক প্রাণে

ঢাকিয়া সব চেয়ে ভাল যে প্রাণ, সেই প্রাণে মিশাইয়া রাখিয়াছিলাম, জগদীশ্বর তা কেমন করিয়া কাড়িয়া নিলেন মা? তাহা হইলে যে আমাকে খুন করা হয় তা কেন ভাবিলেন না। মা, কাঙ্গালিনী বলে একবার উত্তর কর না মা?

উঃ! এমন কষ্ট যেন কেউ পায়না মা। এত জ্বালায় যেন কেহই জ্বলিয়া মরে না মা। মরিলাম মা মরিলাম, মরণইত প্রার্থনা, কিন্তু এই দুঃখ যে জ্বলে মরিলাম। আমি কি পাষাণী? জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইয়া জগতের সারধন হারাইয়া সচ্ছন্দে আছি? আশ্চর্য্য।

সব ফুরায় মা যন্ত্রণা ফুরায় না, সব ফুরায় মা, স্মৃতি ফুরায় না, সব ফুরায় মা, পোড়া চক্ষের জল ফুরায় মা

আচ্ছা আমার প্রসঙ্গ এখন থাক্ তোমার নিকট দুটি কথা বলি। দেবতারা কি রকম লোক মা? দেবতাদের প্রণয়, ভালবাসা কেমন তর মা? দেবতারা কি রকম কথা কন মা? দেবতারা কি স্বর্গে থাকে? স্বর্গ কয়টী?

হ্যাঁ মা স্বর্গ কয়টী ? মানুষ মরিলে যে স্বর্গে যায় দেবতারা কি সেই স্বর্গে থাকেন ? মানুষ মরিলে কি হয় মা ? এত ভালবাসা কেমন করে ভুলে থাকে মা ? যার মুখ ম্লান দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, যার চক্ষের জল নিজ হৃদয়ের শোণিত অপেক্ষা ও অধিক, তাহাকে—এ হেন ভাল-বাসার জিনিস কে কেমন করে ভুলে থাকে মা ? প্রিয় জনের এ মরণাধিক যন্ত্রণা কেমন করিয়া সহ্য হয় মা ? মরামানুষের কি মায়া দয়া নাই ? এত কষ্ট কি দেখিতে পায়না ? মরে কি মানুষ এক যায়গায় যায় ? তবে কি আবার দেখিতে পাব ? হ্যাঁ মা, তবে কি আবার দেখিতে পাব সেইযে, সেইযে জগতে স্বর্ণময়, জীবনে আনন্দ ময়, বিপদে অভয় ময়, সম্পদে সুখময় হতাসে আশ্বাসময়, আশায় ভরসাময় সুখে হাসিময়, দুঃখে অশ্রুময়, প্রণয়ীর সোহাগময়, মরুদেশের প্রবাহময়, সেই যে উপমা বিহীন সেই যে প্রত্যক্ষ প্রেমময়, আমি বলিতে জানি না যে কি ময়, সেই সেই মুখ খানি দেখিতে

পাইব, ? সেই মুখ যাঁহার, তাঁহাকে আবার "আমার আমার" বলিয়া ডাকিতে পাইব ? হ্যাঁ মা, পাইবত ? এই কথাটীর উত্তর এক-বার কর না মা। অনেক দিন আশার মুখ-দেখিনি, আশার সে মোহিনী মূর্ত্তি ভুলিয়া গিয়াছি, সেই মূর্ত্তি একবার দেখাও না মা। তিনি কি স্বর্গে ? হ্যাঁ মা, তিনি কি স্বর্গে ? তুমিওত স্বর্গবাসিনী, তবে সে খবরত তুমি সবই জান। (তোমার পায় পড়ি এক বার বল না মা, তিনিত ভাল আছেন ? এক দণ্ড চখের আড় হইলে তাঁহার অমঙ্গল ভাবনা মনে আসিত। পত্র পাইতে দুদিন বিলম্ব হইলে পাগল হইয়া যাইতাম।) সেই আমি এই কত দিন সংবাদ পাই নাই, কত দিন তাঁহার অবস্থা শুনি নাই, কত দিন পত্র লেখেন নাই, সে জন্য আর কিছুই করি না। পত্র লিখিতে বড় ইচ্ছা করে, তা কোন্ ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে, তাহাত জানি না। স্বর্গের ঠিকানা কি মা ? কোন্ পোষ্টাফিষে পত্র লিখিতে হয় মা ? বল না মা

দেব কন্যারা লেখা পড়া জানেন, স্বামীর পত্র পাইলে—ভালবাসা পূর্ণ পত্র পাইলে কেমন আনন্দ হয় তা জান মা? সে সুখরে স্বাদ জান মা? সে সুখ আমি যে কত ভোগকরিয়াছি, তা আর কি বলিব? তিনিত বাড়ী থাকিতেন না, প্রতি সপ্তাহে আমার এক এক খানি পত্র আসিত। আমি যে সে পত্র কতবার পড়িতাম, কত বার আঘ্রাণ লইতাম, কতবার বুকে রাখিতাম, তাহার সঙ্খ্যা নাই। সে সব পত্র আজিও কত বার দেখিয়া থাকি, কিন্তু তখন হাসিয়া দেখিতাম, এখন কাঁদিয়া দেখি। তা যাই হোক মা, যে দিন গিয়াছে তাহা আর হইবে না, সে সুখ গিয়াছে, আর পাইব না, সেই সকল প্রণয়মাখা পত্র আমার আর আসিবে না!

ভাল কথা, তিনি কেমন আছেন? সেখানেত কোন অভাব-নাই? তাঁহাকে ভাল বাসিবার কেউ আছেত মা? তাঁহার মর্ম্ম কেহ বুঝিয়াছেত? কিছুরত কষ্ট হইতেছে না? আমাকে কি মনে-

করিতেছেন? আমার জন্য কি কষ্ট পাইতেছেন? একবার বল না মা, পোড়া মুখে কি বলিব? বাটী হইতে গেলে আমার বড় প্রাণ পুড়িত, তার পর যখন লিখিতেন আমার জন্য বড় কষ্ট পাইতেছেন, তখন যেন নিজের কষ্ট ভুলিয়া যাইতাম। একটু একটু কষ্ট পাইতাম বটে, অথচ আহ্লাদে যেন গলিয়া যাইতাম। আমিত তাঁহার অশুভাকাঙ্ক্ষিণী নই, তাঁহার সুখেই আমার সুখ, তাঁহার কষ্টেই আমার কষ্ট। তবে তিনি আমার জন্য কাতর হইলে আমার সুখ হইত কেন মা? কোথায় আজ সেই দিন, কোথায় আজ সেই সুখ! কোথায় আজ সেই আমি আর কোথায় আজ সেই তিনি! বাটী আসিবার সময় হইয়াছে, দুর্গোৎসব ফিরিয়া আসিয়াছে! আজ কোথায়, আমার দুর্গোৎসবের দুর্গোৎসব আজ কোথায়? উঃ! আঃ! দুর্গা! সব ফুরায় মা, বিষের জ্বালা ফুরায় না মা। ভাল কথা, বল না মা তিনিত সুখে আছেন? তিনি ভাল থাকিয়া আমাকে

মনে না করেন, এখন তাহাও আমার সুখ। তাঁহার মনের ভাব এখন কেমন হইয়াছে? আমি তাঁহাকে দেখিতে চাহিনা, তাঁহার পত্র পাইতে চাহিনা, সে সকল "অতুল সুখ" কিছুই চাহিনা কেবল এই টুকু শুনিতে চাহি যে তিনি ভাল আছেন—স্বর্গে আছেন। এই টুকু শুনিলে স্বর্গ সুখের অধিক সুখী হইব। তবে একবার বল না মা? কাঙ্গালিনী ব'লে এই উত্তরটা কর না মা! ওমা তোমার পায় পড়ি!

মা! অনেকক্ষণ তোমার কাছে বসিয়া আছি অনেক রকম চীৎকার করিতেছি, তুমি কি বিরক্ত হইতেছ? আমাকে কি তোমার আপদ মনে হইতেছে? তা হ'তে পারে। আমার কথা তোমার ভাল লাগিবে কেন মা? আমার কথা প্রলাপ বোধ হবে না কেন মা? আমার দুঃখে তোমার প্রাণ কাঁদিবে কেন মা? আমার কথা কয় জনের মনে লাগে মা? যার এমন বাড়াভাতে ছাই পড়িয়াছে, সে বই আর আমার দুঃখে কে কাঁদিবে মা? প্রতিদণ্ডে, প্রতি পলে

যে শত শত সর্পঘাতে জ্বলিতেছে, সে বই আজ আমার দুঃখে কে কাঁদিবে মা? এই দুর্গোৎসবে যার মাথায় বজ্রাঘাত হইতেছে সে বই আর আমার দুঃখে কে কাঁদিবে মা? দুর্গোৎসবের প্রতি উৎসবে যার শোকানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইতেছে, সে বই আর আমার দুঃখে কে কাঁদিবে মা? প্রতি বাদ্যশব্দে যার বুকে শত বজ্র বাজিয়াছে, সে বই আর আমার দুঃখে কে কাঁদিবে মা? সঙ্গীতের প্রতি লহরীতে যার দুঃখার্ণব উচ্ছ্বাসিত হইতেছে, সে বই আর আমার দুঃখে কে কাঁদিবে মা? যাহার কুসুমোদ্যানপূর্ণ জীবন, একেবারে মরুভূমিময় হইয়াছে, সে বই আর আমার দুঃখে কে কাঁদিবে মা? যে কেবল বর্ণপরিচিতা মাত্র হইয়া শোকের জ্বালায় বই লিখিতে প্রবৃত্ত হয়, সে বই আর আমার দুঃখে কে কাঁদিবে মা? যার এমন সহৃদয় প্রেমাস্পদ অশেষ গুণালঙ্কৃত স্বামী ধনোপার্জ্জনার্থে বিদেশে জীবনরত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই হতভাগিনী বই আমার

দুঃখে কে কাঁদিবে মা? মা! তুমি রাজরাণী, রাজবালা, পতির অবিচ্ছেদ-প্রণয়িণী, তুমি আমার দুঃখে কেন কাঁদিবে? মানুষের মনের ভাব দেবতায় কেন বুঝিবে? মানুষের মনের ভাব যদি দেবতায় বুঝিত, বুঝিয়া যদি সেইরূপ কায করিত, তবে আজ তোমার কাছে কাঁদিতে আসিব কেন? যদি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তোমা-দের সাধ্যায়ত্ত হয়, তবে আমাদিগকে কষ্ট দিয়া তোমরা আমোদিত হও, সন্দেহ নাই। যাহাই হউক সিদ্ধেশ্বরি! শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতেছি, বুক ফাটিয়া মরি তাই দুটি কথা বলিতে আসিয়াছিলাম মাত্র। দুর্গোৎসব দেখিতে আসি নাই, যে দিন হইতে আমার দুর্গোৎসব সাঙ্গ হইয়াছে সেই দিন হইতে সকল উৎসবে ইতি দিয়াছি। এবার এই পর্য্যন্ত যদি এ দুর্ভর দেহ আগামী বৎসর বহন করিতে হয়, আবার তোমাকে বিরক্ত করিব। আর যদি তোমার আশীর্ব্বাদে এই শেষ হয় তবে এই শেষ!

তুমি কোথায় ?

তুমি কোথায় ? আর কি বলিয়া ডাকিব, কি বলিয়া কাঁদিব, কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিব, তুমি কোথায় ? কি করিলে উত্তর পাইব ? এ কথার কি উত্তর নাই ? এ অনন্ত বিশ্বে অনন্ত কথা আছে, যত কথা আছে, যত প্রশ্ন আছে, তত উত্তর আছে। তবে! তবে এক বার বল না গো তুমি কোথায় ? আর কার কাছে জিজ্ঞাসা করিব, মাকে জিজ্ঞাসা করিলে মা কাঁদেন, দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মুখ ঢাকেন, আত্মীয় স্বজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা নিশ্বাস ছাড়েন। কই আমার কথার উত্তরত কেহই করেন না, সেই জন্যইত তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কোথায় ? (স্বদেশে কি বিদেশে, ভারত-বর্ষে কি অন্যত্র, আসিয়ায় কি ইউরোপে আফ্রিকায় কি আমেরিকায়, মর্ত্ত্যে কি স্বর্গে, তুমি কোথায় ?) যদি স্বর্গেই থাক, যদি স্বর্গসুখ

ভোগ করিতে পাইয়া থাক, তাহা আমার কাছে বলিতে দোষ কি? ডাকিয়া বলিলেওত হয়। আমি রাগ করিব না, দুঃখ করিব না, কাঁদিব না, চিরকালইত জান, তোমার সুখের সংবাদ আমি দূর হইতে শুনিয়াও সুখী হই। তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ। তুমি যদি রাজা হও, লোকে আমাকে রাণী বলিবে, তুমি যদি কাঙ্গাল হও লোকে আমাকে কাঙ্গালিনী বলিবে। তুমি সুখী, সৌভাগ্যবান্ হইবে লোকে আমারই কপালের সুখ্যাতি করিবে, আমারই "লক্ষ্মী লক্ষ্মী" নাম পড়িবে, তাই বলিতেছি যে আমিই তোমার সব! দুর্গা! দুর্গা! সেই তুমি আর এই আমি, আমি তোমার সব! মন কেন একশতটা ছিলনা, হাত কেন দুইশত খানা ছিল না; শত মন ভরিয়া কেন ভাবিতে পাইলাম না যে আমিই তোমার সব! শত হস্তে কেন লিখিতে পাইলাম না আমিই তোমার সব! আচ্ছা, বলি কি এমন যে প্রেম ময় তুমি,

সেই তুমি কোথায় ? এ কথার কি উত্তর দিতে নাই ? যখন যে কথাটী বলিয়াছি, তখনই উত্তর দিয়াছ, আমার জন্য গায়ের রক্ত জল করিয়া ফেলিয়াছ ; আমার জন্যই তোমার সংসার, আমি না থাকিলে লোকে তোমাকে "গৃহশূন্য গৃহী" বলিত। আমার ভাবনাই তোমার মনের প্রধান চিন্তা। আমাকে সুখী করাই তোমার প্রধান কার্য্য, আমার ভালবাসাই তোমার প্রধান আনন্দ, আমার প্রণয়ই তোমার প্রধান সুখ। আচ্ছা তবে দেখ দেখি আমি তোমার কি ? সেই আমার একটী সামান্য কথার উত্তর দিতে পারিলে না ? তুমি কোথায় ? কত কথা বলিয়াছ, কত গল্প করিয়াছ, সেই তুমি আজ একটা কথার উত্তর দেবে না কেন ? তুমি কোথায় ? একবার বল না গো, যাহার জন্য অত কষ্ট পাইয়াছিলে, এ সেই আমি। এই আমি এক সময়ে বন্য পশু স্বরূপ ছিলাম, তুমিই আমাকে মনুষ্যত্ব দিয়াছিলে ; আমি কিছুই জানিতাম না, তুমিই

সব শিখাইয়াছিলে—যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহা তোমার সেই অপ্রতিহত শিক্ষার ফল। তোমার মনোমত তুমিই করিয়াছিলে, তুমি আগে ভাল বাসিয়াছিলে, আমি শেষে ভাল বসিয়াছিলাম; তোমার জন্যই এক হৃদয় হইয়া গিয়াছিলাম। এক হৃদয় হইয়া গিয়াছিলাম? এক হৃদয় বই কি, বুক দুইটী ছিল বটে কিন্তু হৃদয় একই ছিল। যাহাকে ভালবাসিতে, আমি তাহাকে ভাল বাসিতাম, যে বস্তু তোমার প্রিয় ছিল, সে বস্তু আমারও প্রিয় ছিল। জগদীশ্বর বুঝি উভয়ের আস্বাদন শক্তিও একরূপ করিয়াছিলেন। আমি মন রাখার জন্য সেরূপ করিতাম না। কোন দিন তোমার তোষামোদ করিতে হয় নাই। কোন দিন ইচ্ছার বিপরীত কায করিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে হয় নাই। আমি যা করিতাম, তুমি তাহাতেই পরম সুখী হইতে। সেইজন্যইত কাঁদি, ঐ গুণের জন্যইত জ্বলে মরি! এমন যে তুমি, আমার সর্ব্বস্ব যে তুমি, সেই তুমি কোথায়! এত করিয়া

কাঁদিয়া মরি, তবুত উত্তর কর না। আমার মাথা খাও একবার বল, তুমি কোথায়! তুমি কি দেবতা হইয়াছ, মানুষের সঙ্গে কি কথা বলিতে নাই। (এখন আর সে কালের মন নাই, সে সকল মনোবৃত্তি নাই! তাই আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি। আচ্ছা এখন হইতে তাহাই ভাবিব। আপনা ভুলিয়া, জগৎ ভুলিয়া এখন হইতে তোমার দেবত্বের বিষয় ভাবিব। এখন হইতে সেই পবিত্র দেবমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিব। আমি আর কাঁদিবনা, আমাকে আর কাঁদিতে হইবে না!)

(তাইবা আমাকে কে বলিল যে তুমি দেবতা হইয়াছ; তাইবা আমাকে কে বলিল যে তোমার মন, তোমার মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাইবা আমাকে কে বলিল যে তোমার স্বর্গসুখ ভোগ হইতেছে; আর তাইবা আমাকে কে বলিবে যে তুমি কোথায়? কেউ বলিবে না বলিয়াইত তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি। সাকার অভাবেই নিরাকার মানিতে

হয়।) তোমার অভাবেই, মনোমত উত্তরদায়ক অভাবেই শূন্যে জিজ্ঞাসা করিতেছি "তুমি কোথায়"! আর কিছু নয় একটা মুখের কথা, ইহারই কি এত মূল্য! সেই অমূল্য হৃদয় হইতে, সেই অতুল্য ভালবাসা হইতে, সেই অমূল্য অতুল্য জীবনরত্ন হইতে একটী কথার মূল্য কি এত বেশী! আমাকে তোমার হৃদয় দিয়াছিলে, ভালবাসা দিয়াছিলে, জীবন দিয়াছিলে, অকাতরে দিয়াছিলে, হাসিতে হাসিতে দিয়াছিলে, আমাকে হাসাইয়াছিলে বলিয়া নিজেও হাসিয়াছিলে; তাই বলিতেছি আমার সুখেই তোমার সুখ। আর কি বলিতেছিলাম, সে সব জিনিস হইতে একটা কথার মূল্য কত বেশী? আচ্ছা, আমার যাহা আছে সব তোমাকে দিব। তুমি আমার স্বামী, আমার ইহ জীবনের সব, তোমাকে আমার অদেয় কি? কিন্তু আমার কি আছে! যাহা ছিল সে সবই তোমাকে দিয়াছিলাম, তাহা তুমি লইয়া গিয়াছ, কিন্তু যে আধারটীর ভিতর সকল জিনিস পুরিয়া দিয়া-

ছিলাম, তাহা হইতে সব বাহির করিয়া লইয়াছ, কেবল সেইটীর ভিতর রাশীকৃত অগ্নি রাখিয়া, গিয়াছ, আমি সেই অগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়া-আছি। হৃদয়ের সকল শূন্য স্থান সেই অগ্নিতে পূর্ণ হইয়াছে। সেই অগ্নিরাশী মাত্রই আমার আছে, তুমি তাহাই লইবে ? ভাল বাসার শেষ উপহার, প্রণয়ের শেষ উপহার, সুখের শেষ উপহার, সমস্তের শেষ উপহার, আর একটী কথার মূল্য স্বরূপ তাহাই লইবে ? তাহা এখনই দিব। আমি কিছুই চাহি না ; জগতের কোন-জিনিসে, আমার কায নাই। (কাযের যে কায, দরকারের যে দরকার, আবশ্যকের যে আবশ্যক প্রয়োজনের যে প্রয়োজন, তাহাই যদি হারাই-লাম, তবে আর এ জগতে আমার কিছুরই আবশ্যক নাই। তোমার জন্যে আমার জীবন, তোমার জন্যে আমার মান, তোমার জন্যে আমার সম্পদ, তোমার জন্যে আমার সুখ, তোমার জন্যে আমার হাসি, তোমার জন্যে আমার সধবা নাম, তোমার জন্যেই আমার

সব। সেই তুমি, আমার জীবন সর্ব্বস্ব যে তুমি, সেই তুমি কোথায়? একবার বল, এক মুহূর্ত্তের জন্যে বল, আর কোনও দিন সাধিবনা, আজ একবার বল। তুমি দয়াশীল, তুমি পর-দুঃখ-কাতর, পরের দুঃখে কত কাঁদিয়াছ, পরের ভাবনা কত ভাবিয়াছ, পরকে সুখী করিতে পারিলে কত সুখী হইয়াছ, সেই মনে সেই দয়া মাখা মনে আমার কষ্ট যে কত দূর শোচনীয়, তা তুমিই বুঝ। তোমার মনের ভাব আমিই বুঝি; মায়ে বোঝেন বাপে বোঝেন, বন্ধুগণে বোঝেন তোমার দাদা তোমার জীবনাধিক ভাল বাসার ভ্রাতা, তোমার মনের ভাব বোঝেন, কিন্তু আমার মত কেউ বোঝেনা। সমগ্র মনটী ধরিয়াইত আমাকে দিয়াছিলে, সমস্ত ভাব আমি বুঝিব না কেন? তোমার সব জিনিসেইত আমি, প্রাণে আমি, মনে আমি, হৃদয়ে আমি, বেশে আমি, বিন্যাসে আমি, সম্পদে আমি, বিপদে আমি, মানে আমি, লজ্জায় আমি, সব তাতেইত আমি; সেই

আমার—তোমার জীবনাধিকা সেই আমার দেখ দেখি কি দুর্দ্দশা করিয়াছ ? তাতেইত কাঁদি, তাতেইত এত জ্বালা !

তুমি কোথায় ? তুমি সেই গিয়াছিলে সেই যে বিদায় লইয়াছিলে, সেই কণ্ঠে, সেই মুখে, সেই স্বরে, সেই যে ইওলীয় বীণাবৎ পরীর সঙ্গীতবৎ শ্রুতিমুগ্ধমন্ত্রবৎ "আসি" বলিয়া গিয়াছিলে, তবে আসিতেছ না কেন ? কখন মিথ্যা কথা বল নাই, কখন প্রবঞ্চনা শেখ নাই, কখন প্রতারণা কর নাই,—তাতেইত কাঁদি,অতগুণের রাশী বলিয়াইত কাঁদি ; তাতেইত বলি যে এশোকের সান্ত্বনা নাই, এ যন্ত্রণার ধৈর্য্য নাই আমার মন বুঝাইবার কোন কথাই নাই। তুমি যদি অত গুণালঙ্কৃত না হইতে, যদি অত প্রেমময় না হইতে, আর যদি আমাকে অত ভাল না বাসিতে তবেত এমন করিয়া আমার মাথা খাইতে পারিতে না, তবেত এমন করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারিতে না—অথবা সে বুঝি আমার ভুল ! আমার মতন কষ্ট সকলেই

পায় কেন? (সুধু আমি বলিব না, সমস্ত জগৎ বলিবে—যে তোমাকে একদিন দেখিয়াছে, সেও বলিবে তোমার গুণের শেষ নাই। কিন্তু সকলেইত গুণবান হয় না, তবে পোড়া স্ত্রীলোকে অত কষ্ট পায় কেন? হিরর স্বামীরত কত দোষ ছিল, তার জন্যে হির কাঁদিয়া মরে কেন? তবে কি না ভালবাসার চক্ষে দোষও গুণ বলিয়া ভ্রম হয়। সেই জন্যেই হির, পতির ভালবাসা ভাবিয়া চির-বিরহ-কষ্টে কাঁদে। আচ্ছা, নিস্তারিণীর স্বামী বৃদ্ধ ছিল, প্রকৃত প্রণয় দূরে থাকুক নামে মাত্র বিবাহ হইয়াছিল, সেই-নিস্তারিণী অত কাঁদে কেন? "দেশ কাল পাত্র" সকল তাতেই ভেদ আছে। কান্নারও আবার ইতর বিশেষ আছে। নিস্তারিণী জীবনের সৌভাগ্য হারাইয়াছে, সংসারের সম্বল হারাইয়াছে, সে কাঁদিবে না কেন?) তুমি অশেষ গুণালঙ্কৃত, আমি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যবলে তোমার সহিত স্বর্গীয় প্রণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলাম, সেই

তোমার অভাবে আমি অশেষ ক্ষোভে, অশেষ দুঃখে কাঁদি।

এমন যে তুমি সেই তুমি কোথায় ? একবার বল, সেই কণ্ঠে, সেই মুখে একবার বল তুমি কোথায় ? নিতান্তই যদি বলিবে না, নিতান্তই যদি আমার সে দিন আর হইবে না, তবে আমি আমি বাঁচিয়া আছি কেন ? কিসের জন্যে বাঁচিব ? জীবনের উদ্দেশ্য কি ? সুখ। সুখ কোথায় ! প্রণয়ে। হরি ! হরি ! তবে আমি কেন বাঁচিয়া আছি ? কাহার জন্যে বাঁচিয়া আছি। আমি ম'লে কাহারও ক্ষতি হবে না, কাহারও জনম বিফল হবেনা, কেউ "গৃহ শূণ্য" হবে না তবে আমি বাঁচিয়া আছি কেন ? জগদীশ ! জগদীশ ! জগদীশ্বরের মনে এতও ছিল এ অনন্ত বিশ্বে কি জগদীশ্বর কেউ আছেন ? এত দিন ভাবিতাম যে আছেন, কিন্তু সেই দিন হইতে—বলিতে পারিনা সে কোন দিন, ভাবিতে পারিনা সে কোন দিন, এত যে কাঁদি, এত যে কষ্ট পাই এত যে জ্বলে মরি, তবু যে দিনের

কথা মুখে আনিতে পারিনা সেই দিন, এই নূতন জীবন যে দিন পাইয়াছি, সেই দিন, সকল আভরণ যে দিন ফেলিয়া দিয়াছি, সেই দিন, যে দিন হইতে অমঙ্গল চিহ্ন স্বরূপা হইয়াছি, সেই দিন. যে দিন সুখের নিকট হইতে চির বিদায় পাইয়াছি সেই দিন, যে দিন আমার কপাল পুড়িয়াছে যে দিন আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে সেই দিন, সেই ভয়ানক দিন হইতে— সেই ভয়ানকের ভয়ানক দিন হইতে যেন ঈশ্বরের প্রতি কেমন কেমন কি হইয়াছে! ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিতে ভয় হইয়াছে। দয়াময় বলিতে লজ্জা হইয়াছে। এ বিশ্বরাজ্যে যদি কেহ ঈশ্বর থাকেন, তবে এমন করিয়া আমার সর্ব্বনাশ কেন হইল? আমি দীনা, আমার যথাসর্ব্বস্ব কেন চুরি গেল? জগদীশ্বর আমার চক্ষে আগুণ জ্বালিয়া, বুকে মশাল চাপিয়া জীবন ভস্মাবশেষ করিয়া, একেবারে পথের কাঙ্গালিনী করিয়া, আমার সর্ব্বস্ব—ইহ-জীবনের সর্ব্বস্ব কেন কাড়িয়া লইলেন? লইবার সময়ে

একবার চক্ষের দেখাও দেখাইলেন না! ইহাতে পাপ হইল না? দয়া হইল না? একটু চক্ষু-লজ্জা হইল না? হয়ত আমি মহা পাপীষ্ঠা, তাই আমার এমন হইল—তাইবা সঙ্গত হয় কই? আমি পাপীষ্ঠা, আমি মহা পাপীষ্ঠা, সন্দেহ-নাই, কিন্তু আমা হইতে কত মহাপাপীষ্ঠা সুখে সচ্ছন্দে সময় কাটাইতেছে! শুনিতে পাই জগদীশ্বর মঙ্গলময়, তিনি যাহা করেন সবই মঙ্গল উদ্দেশ্যে। সেই যে দুঃখিনী বিধবা এক মাত্র পুত্র মুখ চাহিয়াছিল, সে পুত্রে কাড়িয়া লইয়া জগদীশ্বর বড়ইত, মঙ্গল করিলেন? এ জগতে আমার একটি মাত্র সাররত্ন ছিল আমার জীবনের সুখ সম্পত্তি আশা ভরসা, মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সবই সেই জীবনে। সে জীবন জীবিত থাকিলে আমি রাজরাণী সে জীবন অভাবে আমি কাঙ্গা-লিনী। সে জীবন অবসান করিলে আমার-জীবন একেবারে নষ্ট করা হয়। এ সবত জগদীশ্বর জানেন, তবে কেন তাহাই করিলেন?

মঙ্গল উদ্দেশ্য ? একজন মৃত, অপর জীবন্মৃত, এ মঙ্গল উদ্দেশ্য ? কার কি সর্ব্বনাশ হইতেছিল ? কার চক্ষে বালি পড়িয়াছিল ? কে ঈশ্বরের পায় মাথা খুঁড়িতেছিল, কে ঈশ্বরকে এ মঙ্গল কার্য্য করিতে শিক্ষা দিয়াছিল ? আমার হৃদয়ের রত্ন, আমার জীবনের সর্ব্বস্ব, আমার আমার ভাবিয়াছিলাম প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছিলাম, একদণ্ড চক্ষের আড় করিতে বুক ফাটিয়া যাইত, তাহাই—বাছিয়া বাছিয়া তাহাই কাড়িয়া লইতে লজ্জা হইল না? দয়া হইল না ? পাপ হইল না ? আমাদের প্রতিদণ্ডে পাপ, পায় পায় পাপ। ঈশ্বরের পাপ হয় না? হয়ত সে ঈশ্বর একজন যথেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার দয়া, মায়া, জ্ঞান, বিবেচনা কিছুই নাই। কেবল কৌতুক দেখিতে সৃজন পালন লয় করিতেছেন। ঈশ্বর যাহাই হউন, আমি তাঁহাকে কেমন করিয়া দয়াময় বলিব ?”

তবে আবার বলিতে পারি হে জগদীশ, যদি গরীবের জিনিস ফিরিয়া দাও। কতক দিন

কাঁদাইলে অসহ্য যন্ত্রনা দিলে, এখনত আর সহ্য হয় না। চক্ষের-জল ফুরাইয়াছে, গলার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হৃদয়গ্রন্থি ছিঁড়িয়া গিয়াছে আর ত সয় না! এখন আবার দাও। আবার তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিব, আবার এই আমি সেই আমি হইব। আবার সেই চাঁদমাখা সুধা মাখা, প্রণয় মাখা, ভালবাসা মাখা, স্বর্গীয় জ্যোতিমাখা, দেবতার পবিত্রতা মাখা, দেবেন্দ্রের পারিজাত মাখা, নন্দন বনের সুষমা মাখা, প্রণয়ের সঙ্গীত মাখা, কবির কল্পনা মাখা, কল্পনার প্রতিভা মাখা, আমার সেই যে সোহাগ মাখা, বলিতে পারি না সেই যে কি মাখা সেই মুখ, সেই হাসি হাসি ভুবন ভুলান মুখ, আবার দেখিতে পাইব! সেই মুখ যাঁহার, তাঁহাকে আবার আমার আমার ভাবিতে পাইব! জগদীশ! তোমার পায় পড়ি, জগদীশ, একবার অনাথ বন্ধুর কায কর, একবার আমার সেই দিন দাও—

উঃ! দীনবন্ধো!—যাক্ যাক্ সব যাক্।

আমার সবইত গিয়াছে, আবার কি যাবে ? কি বলিতেছিলাম ?তুমি কোথায়—হাঁ হাঁ ! স্বামিন্ ! আমার জীবনের সর্ব্বস্ব ! পর লোকের সহায় ! তুমি কোথায় ? আমার দুর্ব্বলাত্মার ধর্ম্মবল ! হতাশ হৃদয়ের আশ্বাস ! ভীত চিত্তের অভয় ! তুমি কোথায় ? আমার পূর্ণিমার সুধাংশু ! অমানিশীর শুকতারা ! দুর্য্যোগের বিদ্যুৎ ! তুমি কোথায় ? আমার দুঃখের সান্ত্বনা ! সকল কষ্টের ধৈর্য্য ! মানবজন্মের সুখ ! তুমি কোথায় ? আমার জগতের আনন্দ ! ভবের প্রণয় ! প্রণয়ের মিলন ! তুমি কোথায় ? আমার সম্পদের সৌভাগ্য! সৌভাগ্যের সম্পদ ! বিপদের বন্ধু ! তুমি কোথায় ? আমার জীবনের ভরসা ! রোগের ঔষধ ! যন্ত্রণার শান্তি ! তুমি কোথায় ? আমার সর্ব্বের-সর্ব্বস্ব ! সংসারের বন্ধন ! মুমূর্ষুর অমৃত ! তুমি কোথায় ? প্রিয়তম ! তুমি কোথায় ?

চিত্রপট।

আমার আজ কি হইয়াছে? এইযে সমস্ত সময়টা এইখানে বসিয়া কাটাইলাম। কিসের জন্যে বসিয়া আছি? একটি মনের মতন জিনিস দেখিবার জন্যে বসিয়া আছি। দেখিব, দেখিব তবে দেখিতে পারিনে কেন? কি জানি! ওখানি কি? একথার কি উত্তর দিতে হয় তাহাত জানিনা। আচ্ছা, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে "ওখানি কি?" কি বলিব? নিরুত্তরে কাঁদিব। কান্নারওত বিশ্রাম আছে, এক ঘণ্টা কাঁদিব, নাহয় দুই ঘণ্টা কাঁদিব, তার পরেত চক্ষু মুছিতে হইবে! সেই সময়ে যদি আবার জিজ্ঞাসা করে "ওখানি কি?" তবে কি বলিব? বলিবার কি কথা নাই? আছে; কি কথা আছে? কথা এইযে একদিন—বর্ষার শেষে, একদিন দশমীর চন্দ্র আকাশে উঠিয়া ছিল, মেঘের মাঝে তারা-গুলি মুখ ঢাকিয়াছিল বিন্দু বিন্দু ধারায় কাদ-ম্বিনী অশ্রু ফেলিতেছিল সেইরাত্রে, সেই কাল-

রাত্রে—সেই সর্ব্বনাশের রাত্রে নাকি আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমার জীবনের বিজয়া দশমী হইয়াছে, সেই কালরাত্রে নাকি আমার মনোমন্দিরের উপাস্য দেবতার বিসর্জ্জন হইয়াছে, সেই রাত্রে নাকি আমার হৃদয়াকাশের চন্দ্রমা চির-দিনের জন্যে রাহুগ্রাসে পতিত হইয়াছে! দোহাই ধর্ম্মের! ঈশ্বর দেখিয়াছেন, আমি জানিনা—কি হইতে কি হইল, সত্য কি মিথ্যা আমি কিছুই জানিনা! লোকে আমার বুকে শেল বিঁধাইয়াছে! তাহারই জানে, আমাকে কেন কাঁদায় তা তাহারাই জানে! আমি তাহাদের পায় পড়িয়া মাথা খুঁড়িয়া কত কাঁদিলাম, কিন্তু সে কথা আর কেহই বলিলনা—যে কথা শুনিলে অপহৃত-সর্ব্বস্ব ফিরিয়া পাইব, সে কথা আমাকে আর বলিল না! এরাগ কাহার উপর করিতে হয় তাহাত জানিনা, লোকে বলে "কাঁদিলে কি হইবে? লোকে বলে "কাঁদিলে যদি পাওয়া যাইত, তবে সকলে এক সঙ্গে কাঁদিতাম" কেউবলে "আর কাঁদিওনা

তোমার কান্না আর সহ্য হয় না" এই সকল কথা বলে, এসকল কথায় ত আমার প্রাণ জুড়ায় না, কান্নাত থামে না। যাহা বলিলে সকল বেদনা সারিয়া যাইবে, সকল কান্না থামিবে তাহা কেহই বলেনা—কি বলিতে জানেনা! এরূপ যন্ত্রণা কত সহ্য হয়? যে জন্য কাঁদ, তাই যদি আনিয়া দাও কিম্বা আমার মনের মত একটি সুসংবাদও যদি আনিয়া দাও, তবে কি আর কাঁদি? এত কাল কি কাঁদিয়াছিলাম? তাহা লোকে বুঝিবে না; সেই ক্ষোভ আমার বড় হইয়াছে!

(ওখানি কি?—তাই ত বলিতেছি;) সেই যে দশমীর কালরাত্রি উপস্থিত হইয়াছিল, সেই রাত্রিতে যাহা হারাইয়াছি, তাহা আর পাইলাম না। আবার কত রাত্রি ফিরিয়াছে, কত দশমী ফিরিয়াছে, কিন্তু আমার সে সকল আর ফিরিল না! মনুষ্যের একটী পয়সা হারাইলে সহ্য হয় না, একখানি পুস্তকের মায়া কেহ ত্যাগ করিতে পারে না, কোন সামান্য বিষয়ে নিরাশ হইলে লোকের কষ্টের অবধি থাকে না। আর সেই

কালরাত্রে আমার সর্ব্বনাশ হইল, অতুল নিধি হারাইয়া গেল, রাশীকৃত বিদ্যা জলে ডুবিল, আমার আশা, ভরসা সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইল—এক রাত্রের মধ্যে এতটা কাণ্ড হইল; এ প্রাণে—এ পাষাণ প্রাণে সব সহ্য হইল ! এক-দিন অনুসন্ধান হইল না—এত যত্নের জিনিস, এমন উৎকৃষ্ট জিনিস হারাইলাম, তাহার অনু-সন্ধান হইল না। আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম তাহার জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ হইল না। এমন দারুণ আঘাত পাইলাম, কেহ সে বেদনার ঔষধ দিল না, এমন সর্ব্বনাশ হইল একদিনও কাহার উপর রাগ করিতে পাইলাম না—এ আক্ষেপ কি প্রাণে ধরে? আমি বঙ্গ মহিলা, পরাধীনা অবলা, আমি কিছুই করিতে পারি না, কার্য্যে যাঁহাদের ক্ষমতা আছে, তাঁহারাওত কিছুই করিলেন না ! আমার ভাসুরের দক্ষিণাঙ্গ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হৃৎপিণ্ডে আঘাৎ লাগিয়াছে সত্য; কিন্তু তাঁহার এমন প্রাণাধিক বস্তুর ত অনুসন্ধান করিলেন না। অশ্রুধারায় মুখ

ভাসাইয়া থাকেন ; আমাকে কাঁদিতে দেখিলে নীরবে কাঁদেন, কিন্তু তাহাতে কি হইবে? খুঁজিয়া দেখিলে ত হয়! তাহা কেহ করিলেন না। আমি সে পথ চিনি না ; কোন পথে যাইতে হয় সে পথ আমি জানি না! পথ খুঁজিয়াছিলাম, এখনও খুঁজিতেছি, কিন্তু সে পথ চিনিতে পারিলাম না। আগে যদি জানিতাম, তবে পথটীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রাখিতাম ; কিন্তু আগেত কেহ কিছু জানিতে পারে না। যে দিন রাণা প্রতাপসিংহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দিন কেহই ভাবিয়াছিল না যে এই কুমারকে বনবাস কষ্ট সহ্য করিতে হইবে ; যে দিন অর্ফিয়স ইউরিডিস্‌কে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দিন কেহই জানিত না যে এই সুন্দরী ভুজঙ্গ দন্তে অকালে প্রাণ হারাইবে ; যে দিন আমার "শুভবিবাহ" হইয়াছিল সে দিন কেহ জানিত না যে সেই পরিণয় পরিণামে এই অশ্রুধারায় পরিণত হইবে! আবার তিনি যে দিন আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া-

ছিলেন, সে দিন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই দেখা শেষ দেখা, পুনরায় দেখা হইবে না!) আগে যদি ঘুণাক্ষরে কিছু জানিতাম তবে কি প্রাণ থাকিতে যাইতে দিতাম, তাহা হইলে কি প্রাণ থাকিতে চক্ষের অন্তরাল করিতাম! তিনি মরিবার পূর্ব্বে তাঁহার সম্মুখে মরিতাম—বিষ খাইতাম, তীক্ষ্ণাস্ত্রে বুক চিরিয়া ফেলিতাম। আচ্ছা, এখন মরিলেওত হয়, আমি কিসের জন্য বাঁচিয়া আছি? জীবনের সুখ, সম্পত্তি মান, সম্ভ্রম, আশা, ভরসা সবইত গিয়াছে, এখন শূন্য দেহ লইয়া কেন বাঁচিয়া আছি? কিসের জন্য বাঁচিয়া আছি? কিসের জন্য আবার বাঁচিয়া আছি, মৃত্যু হয় না—তাই বাঁচিয়া আছি। মরিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, এখনও করিতেছি, নিতান্ত কপালে মৃত্যু লেখা নাই, তাই বাঁচিতে হইয়াছে। কেমন করিয়া চেষ্টা করিলাম? জলে ঝাঁপ দিলাম না, গলায় দড়ী দিলাম না, পর্ব্বতের উপর হইতে পড়িলাম না, তবে কেমন করিয়া মরিবার চেষ্টা করিলাম? কেন কায়মনোবাক্যেত মৃত্যু যাচ্ঞা

করিতেছি—তাহাতেত মরণ হইল না, বোধ হয় হইবেও না। ভাল! যাহা করিলে মৃত্যু হয়, তাহাই করি না কেন? আত্মহত্যা করিয়া মরিব—যাঁহার জন্য মরিব পাছে তাঁহাকে না পাই? আমি কি পাগল হইলাম! তাঁহাকে আর পাইব না, সেই সন্তাপ-হারী মুখ আর চক্ষে দেখিব না, সেই মুখের সেই মধুমাখা কথা—যে কথা শুনিলে আহ্লাদে গলিয়া পড়িতাম, সে কথা আর শুনিব না! যাহার অভাবে আমি সব হারাইয়াছি, যাহার অভাবে এ রমণীজন্ম বিফল হইয়াছে, যাহার প্রভাবে অতুল সুখ পাইয়াছিলাম, যাহার অভাবে এ দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছি, সেই যে সকলের সব, তাঁহাকে আর পাইব না! তবে মরিতে চাই কেন? মরিলে কি হইব, কোথায় যাইব তাহা জানি না—কেহই জানে না। পণ্ডিতেরা জানেন না, ধর্ম্মোপদেশকেরা জানেন না; বেদ, শাস্ত্র, আগম, পুরাণ প্রভৃতি কিছুতেই প্রকৃত কথা বলিতে পারে না। (মরিলে যদি তাঁহাকে না পাই, মরণে যদি সুখ না হয়, তবে

মরিতে চাই কেন? মরিলে ও যদি তাঁহার সহিত দেখা না হয়, আর যদি সহস্র কষ্টও পাইতে হয়, তথাপি এ ভস্মাবশিষ্ট জীবন অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। তবে, তবে মরি না কেন? কেমন করিয়া মরিতে হয় তাহা যে জানি না—হরিবোল হরি! মরিতে আবার জানি না কেমন! মরিতে আবার শিখাইবে কে? মরিলেই মরণ হইল। প্রকৃত কথা মরিবার সাহস নাই। ভীরু বঙ্গ-বালা, অন্ধকার রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে পারি নাই, মৃত্যুতে—আত্ম-হত্যা করিতে কেমন করিয়া সাহসী হইব? তবে সেই দিন পারিতাম—যে দিন আকাশ হইতে পাতালে পড়িলাম, যে দিন দারুণ বজ্র বুকে বাজিল, সেই নৃশংস দিনে সবই পারিতাম। কিন্তু লোকে ধরিয়া বাঁধিয়া মরিতে দিল না, তাই বাঁচিয়া আছি। সেই জন্যই বাঁচিতে হইয়াছে।

মনের জ্বালায় ভুলিয়া গিয়াছি। ও খানি কি? সেই কথাইত বলিতেছি, সেই যে দশমীর

কাল রাত্রি উপস্থিত হইয়াছিল, সেই দিন যাহা হারাইয়াছি, যাহা আর এ জন্মে পাইব না, যাঁহার জন্য এমন কাঙ্গালিনী হইয়াছি, যাঁহার জন্য জগতের বন্ধন খসাইয়া ফেলিয়াছি, যাঁহার জন্য জীবনে সুখ সচ্ছন্দতা সব হারাইয়াছি, যিনি আকাশে তুলিয়া একেবারে পাতালে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া গিয়াছেন, যিনি এত দুরবস্থা করিয়াছেন, জগতের ঘৃণিতা করিয়াছেন, এত অধিক অপমানিতা করিয়াছেন, তবু আবার যাঁহার জন্য কাঁদিয়া মরিতেছি, ও খানি (সেই তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি—সেই ভুবনমোহন ছবি, সেই অতুলনীয় মুখের চিত্র।) সেই দশমীর কাল রাত্রিতে যে মুখ হারাইয়াছি, সেই যে বসন্ত-গোলাপের ন্যায়, শরদিন্দু-জ্যোতির ন্যায়, ঊষার-সমীরণ-মুগ্ধ বিহঙ্গম সঙ্গীতের ন্যায় মুখ খানি, সেই হৃদয় সরসী-প্রণয় কমলবৎ, মানস-খণিস্থ প্রিয় মণিবৎ, নভোস্থিত ইন্দ্র-ধনুবৎ মুখ খানি, সেই যে প্রিয় সমাগম স্বপ্ন স্বরূপ, দীর্ঘ বিরহে মিলন স্বরূপ, সৃষ্টিকর্ত্তার

মানস-সৃজিত মুখ খানি, সেই যে বর্ণনায় অবর্ণনীয়, ভাবনায় অভাবনীয়, অতীতে আনন্দ-বৎ, বর্ত্তমানে মরীচিকাবৎ মুখ খানি—যে মুখ ভাবিতে ভাবিতে মরিয়া বাঁচি সেই মুখ খানি, যে মুখ ভাবিতে ভাবিতে বাঁচিয়া মরি সেই মুখ খানি, ঐ আমার সেই মুখ খানি। ঐ আমার সেই মুখ খানি। ঐ মুখ দেখিবার জন্য পাগলিনী হইয়া বেড়াইতাম, ঐ মুখ দেখিলে প্রাণে সুখ ধরিত না, ঐ মুখের গর্ব্বে ইন্দ্রের সিংহাসনও তুচ্ছ ভাবিতাম, ঐ মুখ দেখিলে ভূত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যাইতাম ঐ আমার সেই মুখ খানি! ঐ মুখ দেখিতে দেখিতে চক্ষের পল্লব নড়িত না, ঐ আমার সেই মুখ খানি! ও মুখ যখন নিকটে থাকিত, তখন ও মুখে হাসি, আমার মুখে হাসি, চারি চক্ষে হাসি, দুই মনে হাসি, সেই সঙ্গে সবই হাসিত। সেকালে সবই হাসিত। চাঁদ হাসিত, তারা হাসিত, ফুলগুচ্ছ হাসিত, সমীরণ হাসিত, বিদ্যুচ্ছলে কাদম্বিনী হাসিত, ঘর

হাসিত, পালঙ্ক হাসিত, বিছানা হাসিত, প্রদীপ হাসিত, সবই হাসিত, স্বপ্নচ্ছলে নিদ্রাদেবী পর্য্যন্ত হাসিতেন। এখন তাহারা সকলেই কাঁদে, এখনকার কালে কেবলই কান্না! তবে কি জগতের সঙ্গে আমার কোনরূপ সম্পর্ক আছে? সেকালে—আমরা যে কালে হাসিতাম, সে কালে সমস্ত জগৎ হাসিত, এখন আমি কাঁদি, সমস্ত জগৎ কাঁদে! এ কি! এরূপ হয় কেন? হয় ত ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি। জগৎ তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই, অত রূপ, অত গুণ, জগৎ ভুলিতে পারে নাই—তিনি কি কাহারও ভুলিবার জিনিস? জগৎ সংসার সে রূপে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে গুণে বদ্ধ রহিয়াছে তিনি কি কাহারও ভুলিবার জিনিস! কেবল ঐটুকু সুখ—যখন কাঁদি তখন অনেকে কাঁদে। তখন কেমন একটু তৃপ্তি হয়, এই জীবনে তখন যেন কেমন একটু তৃপ্তি হয়, তাঁহার জন্য অনেকে কাঁদিলে যেন কেমন একটু তৃপ্তি হয়। প্রাণ খুলিয়া কাঁদিলে যেন কেমন

একটু তৃপ্তিহয়, এজীবনে ঐটুকুই সুখ। কাঁদিবার সময়ে যে কেহ কান্না থামাইতে চেষ্টা পায়, তাহার উপর যেন রাগ হয়। কান্না যে কি জিনিস, তা অনেকে বোঝেনা, দুঃখের প্রাণে কান্না যে কতদূর তৃপ্তিকারিণী তা অনেকে বোঝে না, এ কান্নার মর্ম্ম অনেকে বোঝে না, আমিও পূর্ব্বে বুঝিতাম না, এখনই বুঝিয়াছি, রোদনজনিত শান্তি এখনই চিনিয়াছি, পূর্ব্বে চিনিতাম না। যাহা হউক জগদীশ্বর যাহাকে না কাঁদাইয়াছেন, সে যেন কখনই কাঁদেনা; এ অনলে— এ কালানলে যেন কেহই দগ্ধ হয় না!

ঐ আমার সেই মুখখানি। ঐ যদি আমার সেই মুখখানি, তবে আবার কাঁদিতেছি কেন? ঐ মুখ হারাইয়াইত কাঙ্গালিনী হইয়াছি, ঐ মুখ হারাইয়াছি বলিয়াইত সর্ব্বস্বের অভাব হইয়াছে, ঐ মুখ হারাইয়াছি বলিয়াইত এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছি, আজ যদি সেইমুখ পাইয়াছি, তবে একটু হাসিলামনা কেন? আহ্লাদে মন উথলিয়া উঠিলনা কেন! দুর্দ্দণ্ড প্রাণ ভরিয়া

দেখিতে পারিতেছিনা কেন? কি দেখিব? ওত সে মুখ নয়, সেই মুখের ছায়া মাত্র। নয়নে দৃষ্টি নাই, মুখে কথা নাই, অধরে হাসি নাই। কাঁদিয়া মরিলে চাহিয়া দেখিবে না, হাসিতে লাগিলে হাসিবে না, মনের কথা কহিলে বুঝিতে পারিবে না, অনেকদিনের পরে দেখা হইয়াছে বলিয়া পাঁচটা কথা কহিবে না, এত যন্ত্রণা পাইয়াছি বলিয়াও একটু আদর করিবেনা, কেবল কাঁদাইতে পারে! কেবল ঐ গুণটুকুই আছে! সেই অনুপম কেশ বিন্যাস, সেই সুদৃশ্য ললাট, সেই সুন্দর ভ্রূযুগল, সেই মনমোহন চক্ষু, সেই সুকোমল দৃষ্টি, সেই সুরম্য অধর, সেই রমণীয় মুখশ্রী, সেই কমনীয় অবয়ব, সবইত সেইরূপ—কিন্তু দগ্ধ মন জুড়ায় না—জুড়ান দূরে থাকুক দ্বিগুণ জ্বলে! মরুভূমে মরীচিকার ন্যায় যন্ত্রণা বাড়ায় মাত্র! দেখিতে ইচ্ছা করে, দেখিলে মরি! দেখিলে সেই অগ্নি সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠে, সেই সর্প সহস্র দন্তে দংশন করে, সেই বজ্র সহস্র মূর্ত্তি ধরিয়া হৃদয়ে

পতিত হয়! তবু আবার দেখিতে ইচ্ছা করে, এ যে কেমন দুর্নিবার লালসা তবু আবার দেখিতে ইচ্ছা করে! সে মুখ না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তাই আবার দেখিতে হয় হৃদয়ের মধ্যেত সর্ব্বদাই আছেন, সময়ে সময়ে মনের চক্ষে জাগিয়া উঠেন। চিত্ত পটে ছায়া মাত্র আঁকিয়াছে, চিত্তপটে অবিকৃত, উজ্জ্বল মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা হইলে কি হয়, সে মূর্ত্তি খুঁজিতে গেলে হারাইয়া যায়, অনন্যমনে ভাবিতে গিয়া ভুলিয়া যাই, কল্পনায় সম্পূর্ণ বিকৃত অনুভূত হয়! আবার—কোথা হইতে আবার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়। এই পাইলাম, এই ধরিলাম, এই লুকাইয়া গেল! যখন ধরিতে গিয়া হারাই, তখন সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গের ন্যায় বিদ্যুৎ-ভ্রান্ত পান্থের ন্যায়, মৃগ তৃষ্ণা মুগ্ধ সীকারীর ন্যায় অ-সহনীয় যন্ত্রণা পাই! সকল যন্ত্রণার শান্তি আছে এযন্ত্রণার কি শান্তি নাই? সকল কষ্টেরই সীমা আছে, এ কষ্টের কি সীমা নাই? সকল উৎ-পত্তিরই লয় আছে, এ উৎপত্তির কি লয় নাই?

রোগী ঔষধ সেবনে আরোগ্য হয়, পুড়িয়া গেলে শীতল জিনিসে আরাম হয়, বেদনা হইলে সেক তাপ দিলে নিবারণ হয়, কাটিয়া গেলে জল দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। এরোগের, এজ্বালার, এব্যথার, এআঘাতের কি ঔষধ নাই? শরীরের সকল কষ্ট নিবারণ করিবারই উপায় আছে, মনের কষ্ট নিবারণ হয়না—হয় না? অবশ্য হয়। কোন অভাব হইলে যে ভাবোদয় হয়, তাহার নামই কষ্ট; সেই অভাব পূর্ণ হইলে যে ভাবোদয় হয়, তাহার নামই সুখ। আমার যে অভাব হইয়াছে, তাহা আর এজন্মে পূর্ণ হইবে না, সুতরাং আর এজন্মে সুখের মুখ দেখিতে পাইব না। এদুঃখ এক দিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য। আচ্ছা জগতের কিছুইত চিরস্থায়ী নহে—আমিত চিরস্থায়িনী নই, তবে দুঃখ কষ্ট চিরস্থায়ী কেন?—চিরস্থায়ী কে বলিল? এ দুঃখের, এ অসীম কষ্টেরও এক দিন সীমা হইবে, এ দুঃসহ যন্ত্রণারও এক দিন শান্তি আছে। সে কোন্ দিন? যে দিন প্রাণ বায়ু

অনন্ত-বায়ুতে মিশাইবে—কি হইবে তাহা জানি না—যে দিন এই দেহ চিতাভস্ম মাত্র হইবে, যে দিন আমি জগৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়া এক অনাবিষ্কৃত স্থানে যাইব, যেখানে গেলে আর জগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না, সেই দেশে যে দিন যাইব, যে দিন মন পুড়িয়া ছাই হইবে, মনোবৃত্তি পুড়িয়া ছাই হইবে, হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইবে, সেই দিন এ দুঃসহ যন্ত্রণার হাত এড়াইতে পারিব; কিন্তু জগতে যত দিন রহিব, ততদিন এই আগুণে পুড়িতে হইবে। মস্তকহীন তাল জাতীয় বৃক্ষের ন্যায়, দাবানল-দগ্ধ অরণ্যের ন্যায়, জীবন শূন্য জীবের ন্যায়, শূন্য হৃদয়ে, হতাশ চিত্তে, যন্ত্রণাপূর্ণ জীবন লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে! সেই আক্ষেপেই কাঁদি। কি ছিলাম, কি হইলাম, আরো কি হইতে হইবে, ভাবিলে যেন চেতনা শূন্য হইতে হয়। সেই ক্ষোভেই কাঁদি!

(দুর্ল্লভ জন্ম মানব জন্ম, সুখের জীবন রমণী জীবন, সৌভাগ্যের সৌভাগ্য দেবানুরূপ

স্বামী; আমার সে সবই হইয়াছিল, জন্ম জন্মান্তরের শত শত তপস্যার ফল ফলিয়াছিল, হায় রে! সকল জিনিস একদিনে হারাইলাম, সেই কাল-দশমী-রাত্রে আমার সর্ব্বস্ব হারাইলাম, সেই এক রাত্রের মধ্যেই আমার অবস্থার এই দারুণ পরিবর্ত্তন হইল! কোথায় বসন্তকুসুম শোভিত উদ্যান, কোথায় নিদাঘ-তাপিত মরুভুমির বালুকারণ্য, কোথায় উৎসব পূর্ণ রাজপ্রাসাদ, কোথায় চিতাময় মহা শ্মসান, কোথায় ভাগ্যবতী সধবা,—আর কোথায় হতভাগিনী বিধবা! আমার পরিণাম এই হইল! এমন সর্ব্বনাশ হইয়াছে। জগদীশ! আমার এমন সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এমন সর্ব্বনাশেও আমার প্রাণ গেল না? মনুষ্যের প্রাণ এমন কঠিন, ইহা ত স্বপ্নেও জানিতাম না! আগে যাহা স্বপ্নে ভাবিতেও ভয় পাইতাম, যে ভয়ে মরমে মরিয়া থাকিতাম, যে কথা মনে আসিবামাত্র বালাই বলিয়া দূর করিয়া দিতাম, আমার তাই হইল? যাঁহার পায়ে বেলের কাঁটা ফুটিয়াছিল, আমি

সহ্য করিতে পারি নাই, যাঁহার মাথা ধরিলে আমার বুকে শেল বিঁধিত, তাঁহার এমন অমঙ্গল আমাকেই দেখিতে হইল? যিনি নিকটে না থাকিলে দশ দিক শূন্য দেখিতাম, কিছুতেই উৎসাহ হইত না, কোন বিষয়েই স্ফূর্ত্তি জন্মিত না, কোন কাজেই মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না, তাঁহারই চিরবিরহ সহ্য করিতে হইল! সেই দেহ—সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ, সেই অশেষ যত্নের দেহ কি হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু বলিতে পারি না। মুখে বলিতে গেলে যেন তাঁহার অকল্যাণ হয়, যেন তাঁহাকে গালি দেওয়া হয়, যেন আমার বুক ফাটিয়া যায়! জগতে যে, সে নখাগ্রও নাই, তাহা আমি জানি, কিন্তু কেমন যে ভুল, কি ভাবিতে ভাবিতে যেন কি ভাবিয়া ফেলি. সিঁথীতে হাত পড়িলে যেন সিঁদুর মুছিবার ভয় করি। হায় রে! কেমন করিয়া এমন সর্ব্বনাশ হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না, জন্মের শোধ একবার চক্ষের দেখা দেখিতে

পাইলাম না। কত মনের কথা মনে থাকিয়া গিয়াছে, কত অপূর্ণ আশা লইয়া গিয়াছেন! জগতে আসিয়া সুখভোগ কিছুই হইল না! এত ভালবাসার বন্ধন কেমন করিয়া খসাইলেন? এত আশা কেমন করিয়া সংযত করিলেন? সেই হৃদয়ে—সেই কোমল হৃদয়ে পাষাণ বাঁধিয়া জগৎ হইতে কেমন করিয়া বিদায় হইলেন? হতভাগিনীর কথা একবার ভাবিলেন না?——

না না সে আমার ভুল, তিনি সাধ করিয়া যান নাই, ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, তাই গিয়াছেন, তাই যাইতে হইয়াছে। আমাকে চোখের অন্তরাল করিতে যিনি কষ্ট পাইতেন, এত কষ্ট দেওয়া কি তাঁহার সাধ? একথা কখনই সম্ভবে না। তাঁহার এত যত্নের জিনিস সবই পড়িয়া রহিল, কিছুই ভোগ হইল না—কিছুই তাঁহার সঙ্গে গেল না। কই আমিত তাঁহার চির-সহচরী, আমিও তাঁহার সঙ্গিনী হইলাম না! তাঁহার সঙ্গে আমার কিছুই গেল না? প্রাণ গেল

না, শরীর গেল না কোন অবয়ব গেল না, একটা ইন্দ্রিয় গেল না, কিছুই গেল না। যদি তাঁর সঙ্গে আমার কিছু যাইত, তাহা হইলে কতক তৃপ্ত হইতাম সন্দেহ নাই। সে কালে ভাবিতাম, যদি তাঁহার কোন অমঙ্গল দেখিতে হয়, তবে সেই মুহূর্ত্তেই এ প্রাণ বহির্গত হইবে, সেই প্রাণত এই—সেই প্রাণ আজিও গেল না? জীবনের সর্ব্বস্ব হারাইলাম, জীবন গেল না! এ রাগ কাহার উপর করিব? এ দুঃখে কাহার কাছে কাঁদিব? এত আশা এত ভালবাসা, এত প্রণয়, এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত যশ, এত গুণ, এত রূপের রাশী, সব পুড়িয়া কেবল ছাই হইল? উঃ! কি করিয়াছ জগদাশ! কেমন করিয়া এ কাষ করিলে জগদীশ! তোমার দয়ার শেষ পরিচয় পাইলাম! তা তোমার দোষ কি? আমার কপাল। কিন্তু এ কপাল তুমিই গড়িয়াছিলে, কপালে যদি কিছু লেখা থাকে, তা তুমিই লিখিয়াছিলে। তবু বলিতে হয় কপাল! কপাল কথা ছিল তাই রক্ষা! যখন

ঐশ্বরিক ঘটনা বুঝিতে অক্ষম হই, তখন "কপাল" বলিতে হয়। যখন দুঃখানল প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠে, তখন "কপাল" বলিতে হয়। যখন সকল বিষয়ে হতাশ্বাস হই, জগৎ যখন কারাগার হইতেও যন্ত্রণাপূর্ণ বোধ হয়, তখনও এই "কপাল"! ভিন্ন ভিন্ন দেশের কবিগণ ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় এই "কপালের" মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন; এ কপাল সামান্য বস্তু নয়। আমাদের বঙ্গ মহিলাগণের প্রতি কার্য্যেই এই কপাল! আমরা এই কপালের দোহাই দিয়াই বাঁচিলাম! ধন্য, কপালকে এত ধন্যবাদ! আমার এমন সর্ব্বনাশ এই কপালের গুণে হইয়াছে, এ পোড়া কপাল কেন আগুনে পোড়াইলাম না।

দিনমণি অস্তে চলিলে? এ দুঃখিনীর দুঃখ আর দেখিলে না! প্রিয় চিত্র পট! যত্নের ধন! মন মরুভূমের "ওয়েসিস"! আইস, আজিকার মত তোমায় তুলিয়া রাখি। তুমি যাঁহার প্রতিরূপ তাঁহার কাছে এ কষ্টের কথা

বলিতে পাইলাম না, তোমার কাছেই বলিব। রামচন্দ্র সীতা দেবীকে বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্ণ সীতা বাম পার্শ্বে সংস্থাপন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হারাইয়া তোমার কাছেই কাঁদিব!

"সাধে কি জানকী তাঁর চরণের দাসী—
সাধে প্রাণ কাঁদে তাঁর তরে?
কোন্ নারী ভাগ্যবতী, পেয়েছে এমন পতি?
তাঁর সঙ্গে কে না চায় হ'তে বনবাসী—
শত ক্লেশ কে না তুচ্ছ করে!"

মুকুরে মুখ।

অনেক দিনের পরে আজি আয়নায় মুখ দেখিতে আসিয়াছি। এ কি সেই আমি? এ কি আমার সেই মুখ? কেমন কেমন ঠেকিতেছে কেন? কি আশ্চর্য্য! আমার কি হইয়াছে? না, কই? সবইত সেই রকম আছে। নাক, মুখ, চোখ, ভ্রূ কিছুরইত ব্যত্যয় হয়

নাই। তবে আমি এ রকম হইয়াছি কেন? আমাকে আমি আমি ঠেকিতেছে না কেন? এ আবার কি! অবাক! না না ভ্রম নয়, স্বপ্ন নয়, এ যে আমি, এই যে আমারই মুখ।

আমি আয়নায় মুখ দেখিতেছি। আগেও কত শত দিন দেখিয়াছি—তখন নিত্যই দেখিতে হইত। চুল বাঁধিবার সময়ে, সিন্দুর পরিবার সময়ে নিত্যই দেখিতে হইত। এখন ত আর চুল বাঁধিতে হয় না, সিন্দুর পরিতে হয় না, আয়নায় কোন দরকার হয় না, সেই জন্য মুখ দেখিতেও পাই না। তখন যে মুখ দেখিতাম, আর আজ যে মুখ দেখিতেছি, ইহাতে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে; তখন এই সিঁথীতে সিন্দুর ছিল, এই কেশ বন্ধন থাকিত, এই কর্ণে ভূষণ ছিল, এই মুখে সেই অম্লান হাসি সর্ব্বদাই থাকিত। আজ যে মুখ দেখিতেছি ইহাতে চুল খসিয়া জটা প্রায় হইয়াছে, সেই সিঁথী ধু ধু করিতেছে, কর্ণে অলঙ্কার পরিবার চিহ্ন মাত্র রহিয়াছে, সেই হাসির কেমন

ভাব তাহা কল্পনা করিয়াও দেখিতে পাইতেছি না। এ মুখের পরিণাম এই হইয়াছে ! এক সময়ে এই মুখ কত সুবেশে সাজাইতাম, এই দেহে কত বস্ত্রালঙ্কার পরাইতাম, এবং এই অঙ্গে কত অঙ্গরাগ লেপন করিতান। এ সকল কেন করিতাম ? কোন সুখে করিতাম ? কার জন্যে করিতাম ? কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না ! ঋতু রাজের মনস্তুষ্টির জন্যে ধরণী সুসজ্জিতা হয়, দুর্গোৎসবের জন্যে বঙ্গ সুশোভিতা হয়, আর স্বামী সুখেই বঙ্গাঙ্গনা বেশ বিন্যাস করে। বঙ্গ মহিলার সবই স্বামীময়, মন, প্রাণ, গৃহ, গৃহকর্ম্ম, আমোদ, আহ্লাদ, ধন, মান, ভরণ, পোষণ, বেশ বিন্যাস সবই স্বামীময়। যে হতভাগিনী সে ধনে বঞ্চিতা তাহার আর কি তেই আবশ্যক নাই। আমি এখন তাহাই হইয়াছি—যে ভয়ে বঙ্গ মহিলাগণ মৃতপ্রায়া থাকেন, যাহা হইতে বড় গালি আর নাই, যাহা নিবারনার্থে হিন্দুবালা ব্রত যজ্ঞ উপাসনা প্রভৃতি করিয়া দেব সমীপে কল্যাণ কামনা করেন,

আমার সেই অকল্যাণ হইয়াছে, সেই গালির পাত্রী হইয়াছি। আমি শুভ কর্ম্মে বিমুখী হইয়াছি। অযাত্রিক নক্ষত্রের ন্যায় ত্র্যহস্পর্শ তিথির ন্যায় হিন্দু সমাজে পরিত্যক্তা হইয়াছি, কেবল এক জনের অভাবেই আমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে, আমি এখন অমঙ্গল-রূপিনী হইয়াছি!

(কেবল তোমার জন্যে—প্রিয়তম! কেবল তোমার জন্যে আমার এই দুর্দ্দশা।) আগে যদি জানিয়াছিলে, যে এমন করিয়া সর্ব্বনাশ করিবে, তবে অত ভাল বাসিয়াছিলে কিরূপে? অবলার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিলে, পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছিলে কিরূপে? ভূত ভবিষ্যৎ ভুলাইয়া রাখিয়াছিলে কিরূপে? ছি ছি তুমি বড় নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুরতা করিয়া গিয়াছ, চিরদিনই মনে থাকিবে। কিন্তু এই বড় ক্ষোভ রহিল স্বামিন্! এই বড় ক্ষোভ রহিল এমন অন্যায় কাযে, এমন অত্যাচারে, এমন অসহনীয় নিষ্ঠুরতায়, তোমার উপর একবার রাগ করিতে

পাইলাম না! একবার রাগ করিতে পাইলে ঐ মুখের মন জুড়ানো দুটি কথা শুনিতে পাইলে আমি সকল দুঃখই ভুলিতে পারিতাম। তুমি ত জান আমি তোমার উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারি না—ও মুখে যে কি আছে তাইতেও মুখ দেখিলে মনে রাগ থাকে না; তুমিত সব জান। আমার কথা তুমিই জান, তোমার কথা আমিই জানি, আমাদের প্রসঙ্গ আর কেউ জানে না, এ সব কথা আর কেউ কেমন করিয়া জানিবে? সেই আমাকে—অত স্নেহের যে আমি সেই আমাকে এমন দুঃসহ যন্ত্রণা কেমন করিয়া দিতেছ? কোথায় বসিয়া দেখিতেছ? হায় রে, বলিতেও ক্ষমতা নাই, বলিতেও পারিলে না!

(উঃ। কি কষ্টেই ফেলিয়াছ! জগদীশ্বর কোথায় বসিয়া এত সুবিচার করিতেছেন? আচ্ছা, এ পৃথিবীতে রোগ, শোক, দুঃখ অনিবার্য্য, স্বীকার করিলাম। জন্মের সহিত মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ রহিয়াছে, স্বীকার করিলাম?

তা পূর্ণ সময়ে বৃদ্ধাবস্থায় মরিলে ক্ষতি কি? প্রাতে বা মধ্যাহ্নে সূর্য্যদেব অস্তগামী হয় না কেন? তবে এরূপ অবিচারের কারণ কি? জগতে এত সুশৃঙ্খল, এত সুবিচার, মানুষের প্রতি এত অবিচার কেন? অথবা ভাল জিনিস মন্দ করাই বিধাতার ইচ্ছা, পূর্ণিমায় চন্দ্র গ্রহণ হয়, প্রফুল্ল কুসুম কীট দংশনে ছিন্ন হয়, শৈশব ও যৌবনাবস্থায় অনেকেরই মৃত্যু হয়। যিনি এবিচারের বিচারক, তিনি কিরূপ লোক?) জগতের সামান্য দেশ বা মহাদেশের রাজাদিগের দয়া, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, বিবেচনা নহিলে চলেনা, আর যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, তাঁহার দয়াধর্ম্ম, বুদ্ধি, বিবেচনা, সহৃদয়তা, সহানুভূতি, কতদূর হওয়া উচিৎ তাহা কে না বুঝিতে পারে? রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত, তার্কিক, আলঙ্কারিক, শাস্ত্রবেত্তা, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি দূরে থাকুন, আমি যে অজ্ঞান-অবলা, আমার এই অকিঞ্চিৎকর বুদ্ধিতেও ইহা উপলব্ধ হয়।

ভাবি কি, এখন যাঁহার জন্যে এত কষ্ট পাইতেছি, তিনিত সকল সময়ে বাটী থাকিতেন না।

তখন তাহার অদর্শন কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম এখন পারিনা কেন ?—এখন অসহনীয় যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কেন ? আশার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিলে সেই আশ্বাস পূর্ণ বাক্য শুনিলে, লোকের আর কোন কষ্টই থাকে না, আশাই জগতের মূলবন্ধন ; আশার কূহকে পড়িয়াই মানুষে সকল সহ্য করিতে পারে। আশা সকল সুখেরও মূল, আশা সর্ব্বনাশেরও মূল। আশার জন্যেই মানুষ বাঁচে, আবার আশার জন্যেই মরে। আশার কথায় ভুলিয়া কত জন অনিয়মে, শ্রমসাধ্য দূরূহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া জীবনের সুখ অথবা জীবন হারাইতেছে। আবার এই আশা, রোগী শোকী ও ভয়ার্ত্ত প্রভৃতি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে সঞ্জীবিত করিতেছে। আশা বীরত্ব দায়িনী, আশা মহত্বদায়িনী, আশা সুকীর্ত্তিদায়িনী, আশা জীবনদায়িনী, এবং আশাই জীবন-নাশিনী। আশা দোষে গুণে অদ্বিতীয়া। আশার মুখ দেখিলে লোকে সকল কষ্ট ভুলিতে পারে। আমার যখন আশা জাগরূক ছিল, তখন আমি

সকল যন্ত্রণা অনায়াসে ভুলিতে পারিতাম। বর্ত্তমান ভুলিয়া ভূত ভবিষ্যতে মনঃ সংযোগ করিতাম। আশার মধুর বাক্যে উৎসাহিত হইলে, স্মৃতির সুখের প্রসঙ্গ শুনিলে, কল্পনার সুখের স্বপ্ন দেখিলে, কার—কোন্ রমণীর হৃদয়ে দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে? "আবার হইবে আবার পাইব আশা থাকিলে, সেই আশায় বিশ্বাস থাকিলে, কেহ কি কখন কষ্ট পাইয়া থাকে?"

এই যে আমি আয়নায় মুখ দেখিতেছি। এই মুখ, এই হতভাগ্য মুখ একদিন সৌভাগ্য-পূর্ণ ছিল। এই মুখের কত আদর ছিল, এই মুখের কত মূল্য ছিল। এই মুখ না দেখিলে একজন দারুণ কষ্ট পাইতেন, এই মুখ দেখিলেই আহ্লাদে পূর্ণ হইতেন। এই মুখ প্রফুল্ল দেখিলে এক জন যে পরিমাণে সুখানুভব করিতেন এই মুখ মলিন দেখিলে তদনুরূপ দুঃখ পাইতেন। এই মুখ দেখিবার জন্য এক জনের চক্ষু সর্ব্বদা তৃষিত থাকিত। এইমুখের কথা শুনিতে এক

জনের কর্ণ সর্ব্বদা উৎসুক হইত। এই মুখ একজনের নিভৃত-চিন্তার বস্তু ছিল। এই মুখ একজনের সুষুপ্ত-সুখ বাসনা জাগরিত করিতে সক্ষম ছিল। এই মুখকে একজন কখন আকাশে উঠাইতেন; কখন জলে ভাসাইতেন, কখনও বা বনে ফুটাইতেন। এমুখ এক জনেরই প্রিয় খেলেনা আদরের বস্তু এবং প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর ছিল। সেই একজন এখন এ মুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন; জানি না কি অপরাধে এমুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই জন্যে এ মুখের শোভা, মূল্য, আদর, সবই গিয়াছে। তাঁহারই অভাবে এমুখ "পোড়া মুখ" হইয়াছে, সেই মুখের পরিণাম এই হইয়াছে!

আমার মুখের পরিণাম এই হইল, জগতের সকল জিনিসেরই পরিণাম আছে। পরিণাম দুঃখ—পরিণাম শোক—পরিণাম বার্দ্ধক্য—পরিণাম—পৃথিবীর প্রকৃত পরিণাম মৃত্যু। শেষ দিনের পথ মৃত্যু। আজি যে আমি আয়-নায় মুখ দেখিতেছি এ আমি শেষদিনে মরিব;

এই যে তুমি "সুখের সুকোমল অঙ্কে বিরাম লাভ করিতে করিতে আমার দুঃখে চাহিয়াও দেখিতেছ না" এই তোমাকেও শেষদিনে সেই পথের পান্থ হইতে হইবে—আমি গালি দিতেছি না, গালি ভাবিওনা, সকল বস্তুরই শেষ আছে। জগৎ সংসারে কেবল একটি বস্তুর শেষ নাই যাহাকে ভাগ্য-লক্ষ্মী কৃপা করিয়াছেন, তাহারই নিকটে একটি জিনিসের শেষ নাই, তাহার নাম আশা। অনন্ত জগতের যদি সকল জিনিসের শেষ হয়, তবে আশার শেষ অবশ্য হইবে, জীবনের শেষ দিনই আশার শেস সীমা। কিন্তু জীয়ন্তে আশার শেষ হওয়া অপেক্ষা কষ্ট আর নাই!—তাতেইত কাঁদি, ঐটিইত যন্ত্রণা, একবারে সকল আশার শেষ হইয়া গিয়াছে, উহাইত যন্ত্রণা! যদি দশ বৎসরান্তে, কি কুড়ি বৎসরান্তে এমন কি মৃত্যুর একদিন অগ্রেও তাঁহাকে—যাঁহার অভাবে সকল আশার শেষ হইয়াছে, তাঁহাকে যদি পাইতাম, তবু সেই

আশা করিয়াই সকল কষ্ট দূর করিতে পারিতাম। কিম্বা জগতে যদি এইরূপ নিয়ম থাকিত যে, মৃতব্যক্তির জগতে আসিবার ক্ষমতা থাকিত না, অথচ জগতের লোকের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিত। আকাশে—যেখানে চাঁদ উঠে, যেখানে সূর্য্য উঠে, যেখানে তারা হাসে, সেই খানে—সেই খানে যদি মৃতব্যক্তির মুখ উদয় হইত, সর্ব্বাঙ্গ মেঘের আড়ালে বা বায়ু সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া, যদি মুখ মাত্র প্রকাশ হইত, আমাদের সমস্ত কথা শুনিতে ও আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে মৃত ব্যক্তি যদি সক্ষম হইত, তাহা হইলে—জগদীশ! জগদীশ! তাহা হইলে আর কিছুই চাহিতাম না, নিকটে বসিতে চাহিতাম না, স্পর্শ সুখানুভব করিতে চাহিতাম না, ধন মান চাহিতাম না, এ বৈধব্য বেশ পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতাম না—প্রাণের সুখটুকু কে লইবে? যদি সেই মুখ, সেই বাল্যের সরলতাময়, যৌবনের গাম্ভীর্য্যময় ও বার্দ্ধক্যের চিন্তাশীলতা-

ময় মুখ যদি সেই মুখ দেখিতে পাইলাম, যদি মনের কথা বলিতে পাইলাম, যদি মনের কথা শুনিতে পাইলাম, তবে আর কি চাই? তবে আর কিসের দুঃখ? যদি সমস্ত দিন আশা করিয়া দিনান্তে বা সপ্তাহে অথবা নির্দ্দিষ্ট দিবসে সেই আশা যদি পূর্ণ হয়, তবে আর কি চাই? হায়! ঈশ্বর যদি সে নিয়ম করিতেন, তবে জগৎ আর এত হাহাকারে পূর্ণ হইত না, আর আশার সঙ্গে আমার ও চিরবিচ্ছেদ জন্মিত না।

এ জগৎ দুঃখময়—দুঃখের আবাস। জগৎ সংসারে কেহ কখন অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ করিতে পারেন নাই। তুমি যাঁহাকে সুখী মনে করিতেছ, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তিনি এত অসুখের কথা বলিবেন যে, তচ্ছ্রবনে তোমায় বিরক্ত হইতে হইবে। জগতের এই এক সংস্কার যে, কেহ মনে করে না "আমি সুখী।" তাহারও কারণ আছে। বিশুদ্ধ সুখ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না, সুখের অবস্থায়

কেহ সুখ চিনিতে পারে না, এবং সুখলাভে কেহ কখন পরিতৃপ্ত হয়না। সুখের সহিত দুঃখের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, কিন্তু দুঃখের ও ন্যূনাধিক্য আছে। একজনের "বিবাহ হয় নাই" বলিয়া দুঃখ; আর একজনের "কেন বিবাহ হইয়াছিল" বলিয়া দুঃখ। আবার বিবাহ হইয়া স্ত্রী পুরুষে এক হৃদয় না হইলে গুরুতর দুঃখ! ভগিনি! তোমার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে "মানুষের সন্তান হয় কেন?" ভাবিয়া কাঁদিতেছ ঐ দেখ কত বন্ধ্যা সন্তানাভাবে মরমে মরিয়া আছে। আবার যাঁহার সন্তান হইয়া বাঁচিয়া আছে, তাঁহারা অশেষ দুর্ভাবনায় অশেষ, জ্বালায় জ্বলিতেছেন। ভাই! তোমার স্বামী বাটী হইতে গিয়াছেন, সেই দুঃখে কাঁদিতেছ, আমি ও দুখের কান্না, ও সুখের কান্না আর এ জনমে কাঁদিতে পাইবনা বলিয়াই, এত কাঁদিয়া মরিতেছি। যাহারা শৈশবাবস্থায় বিধবা হইয়াছে, তাহারা "স্বামী কেমন জানিতে পাইলাম না, সুখ কি তাহা চিনিতে পাইলাম না" ভাবিয়া কাঁদিতেছে, আর আমরা—

"কেন দেখিলাম তারে কেন দেখিলাম ?
সে সব সুখের তার কেন জানিলাম !"

ইহাই ভাবিয়া কাঁদিতেছি। অনন্ত জগতে অনন্ত প্রকার দুঃখ। কিন্তু সধবার দুঃখ, বিধবার সুখ। তখন মনে করিতাম, এই সব বুঝি বড় দুঃখ। দাঁত থাকিতে কেহ দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না—সুখের অবস্থায় সুখের মর্ম্ম বুঝিতাম না !

সুখ যে এমন দুর্ল্লভ বস্তু সে সুখের মূল কোথায় ? সুখের মূল প্রণয়ে। প্রণয় জগতে প্রত্যক্ষ জাগ্রত দেবতা। এই অসীম বিশ্বরাজ্য প্রণয়ের হস্তমুষ্টি মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। জ্ঞানী, ধার্ম্মিক, মূর্খ, পাপী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, কেহই প্রণয়কে জয় করিতে সক্ষম নহেন। দশানন, ভীমসেন প্রভৃতি মহাবীরগণও এক সময়ে প্রণয়ের ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়াছিলেন। যিনি সাহস বলে, চাতুর্য্য বলে, বাহুবলে এই ভারত সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন, সেই মত্ত মাতঙ্গবৎ রণপ্রিয় ক্লাইবও এক স্বর্ণলতায় বন্ধন মানিয়া ছিলেন। কোথায় সেই ে

বীরের নিষ্ঠুরতা পূর্ণ দৃঢ় হৃদয়, আর কোথায় বা ললনার নবনীতময় স্নেহার্দ্র চিত্ত, কোথায় কৃতবিদ্য জ্ঞানী সুসভ্য উন্নত চেতা যুবক, আর কোথায় বা অশিক্ষিতা নিরক্ষরা অবোধ রমণী, প্রণয় কৃপাদৃষ্টিপাত করিলে ইহা ও অভেদ হইয়া থাকে! গিরিশৃঙ্গ হইতে গভীর কূপপর্য্যন্ত সমভূম হইতে পারে! এই প্রণয়ের অলৌকিক ক্ষমতা প্রভাবে মহাত্মা স্যর সামুয়েল রোমিলী মৃতপ্রণয়িনীর পথানুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রণয়ের আকর্ষণ বলে, বীর শ্রেষ্ঠ হেক্টর একদা যুদ্ধক্ষেত্র হইতেও আবাসে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক প্রিয় ভার্য্যার প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রণয়ের কুহক বলেই পার্ব্বতী, সর্ব্ব দেবতা তুচ্ছ করিয়া বৃদ্ধ হরের চরণসেবায় রত হইয়াছিলেন, এই প্রণয়ের শিক্ষাবলে সুকুমারী জানকী বনবাসেও অযোধ্যার সুখ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রণয়ের মহামন্ত্র বলেই ভারত মহিলা অনায়াসে ––পতির জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিতে পারিতেন!

এ প্রণয় কে দেবতা না বলিয়া আর কাহাকে বলা যাইতে পারে? জগতে প্রণয়ই স্বাধীন। রূপ, গুণ, ধন, মান কিছুতেই প্রণয় অধীনতা স্বীকার করেনা কিন্তু প্রণয়ের নিকটে সকলকে দাসত্ব বা দাসীত্ব করিতে হয়। প্রণয় ইন্দ্রজাল ময়, প্রণয় কুরূপকে সুরূপ করিতে পারে, সহস্র অধমকে সহস্র উত্তম করিতে পারে। এই প্রণয় লাভাকাঙ্খায় কত লোক অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জগতের ঘৃণ্য হইতেছে। কত জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কত মহাত্মা "পশুর অধম" বলিয়া মনুষ্য সমাজে পরিগণিত হইতেছেন, তাহার সঙ্খ্যা নাই। ভাল জিনিস মন্দ হইলে সমধিক বিকৃত হয়। সুস্বাদু বস্তু বিস্বাদ হইলে লোকে "বিষাক্ত" বলে। সুগন্ধি দ্রব্য পচিয়া গেলে বড় দুর্গন্ধ হয়। ভাল লোকের মৃত্যু হইলে বড় দুঃখের বিষয় হয়, রমণী হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করিলে রাক্ষসী অনুমান হয়, আর প্রণয় দুষিত হইলে মূর্ত্তিমান কৃতান্ত স্বরূপ হয় তখন আর প্রণয়ে

দেবত্ব থাকেনা! সে যাহা হউক·এই প্রণয় দেবতাকে কবিগণ স্ববর্ণে আচ্ছাদিত করিতেছেন, প্রণয়পদে ভূমণ্ডল মস্তক লুণ্ঠিত করিয়া আছেন। প্রণয়দেবই বিশ্বরাজ্যে—এ অসীম বিশ্বরাজ্যে একাধিপত্য করিতেছেন! এই অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন প্রণয়েরও পরিণাম আছে। আমার প্রণয়ের পরিণাম এতদিনে হইয়াছে—সেই স্বর্গ-সুখের পরিবর্ত্তে এখন জীয়ন্তে নরকাগ্নিতে পুড়িতে হইতেছে। সেকালের হিমশিলার ন্যায় সুখরাশি সেই আগুনে গলিয়াই নয়ন দিয়া প্রবাহিত হইতেছে!

এই যে আমি আয়নায় মুখ দেখিতেছি আমার মুখের পরিণাম কি হইয়াছে, তাই দেখিতেছি। এই তো জগতের অবস্থা তবে মানুষের কি লইয়া আশা? কি লইয়া বন্ধন? কি লইয়া কলহ? কি লইয়া হিংসা? আর কি লইয়াই বা অহঙ্কার? প্রিয় পতি! এক সময়ে যে মুখকে অত বাড়াইয়াছিলে, এক সময়ে যে মুখ "এক দণ্ড না দেখিলে" অস্থির হইয়া বেড়াইতে, আজ

সেই মুখ একবার চাহিয়া দেখিলে না? এত ভালবাসার বস্তু কেমন করিয়া ভুলিয়াছ?—কার কথায় ভুলিয়া এ মরণাধিক যন্ত্রণা দিতেছ? তোমায় নিষ্ঠুর বই আর কি বলিব? সমস্ত জগৎ তোমাকে দয়াশীল বলিবে, আমি তোমায় নিষ্ঠুর বলিব—কিন্তু স্বামিন্! নিষ্ঠুরই হও আর দয়াশীলই হও, আমার প্রতি সেই স্নেহ-থাক্ বা নাই থাক্ এ আমি তোমারই কায় মনোবাক্যে আমি তোমারই! আর তুমি যেখানেই থাক যে লোকেই থাক যাহাই হইয়া থাক তুমি আমারই—আর কাহারও নয়, কেবল আমারই—আমারই সেই প্রেমময় পতি! জীবন সর্ব্বস্ব স্বামী!!

পোড়ামুখে কি বলিব—এ দুঃসহ বিষাদের মধ্যেও একটু আনন্দ আছে—এক ভরা বিষের মধ্যেও এককণিকা সুধা আছে! এই যে তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, এই যে আমার এই "দশমদশা" উপস্থিত হইয়াছে, তবু লোকে যখন "তোমার স্বামী তোমার স্বামী" করিয়া

তাঁহার সেই অসীম দয়ার অসীম গুণের ও অসীম মহত্বের কথা বলে তখন যেন প্রাণের ভিতর কেমন একটু আনন্দ পাই—যখন সেই দেবায়ত পবিত্র মূর্ত্তি "আমারই" বলিয়া ভাবিতে পাই, তখনই যেন প্রাণের ভিতর আনন্দ একটু পাই—আবার সেই মূর্ত্তি জগতে দেখিতে পাই না, অন্তঃস্থলে ছায়া বই প্রকৃত বস্তু দেখিতে পাই না, দিব্য চক্ষু নাই সুতরাং স্বর্গ দেখিতে পাই না—কোথায় গেলে যে দেখিতে পাইব তাও জানি না—তখনই বুকে আগুণ জ্বলিয়া উঠে—তখন কাঁদি! সকল পরিণামই কান্না!

একথা তো বলিলে ফুরাবে না এমন কি এত কথা হইয়াছে!

" কি আর বলিব হায়! কত আর বলিব—
তাপিত তৃষিত চিতে কত আর সহিব
এই পাই এই নাই—হারাইয়া পুনঃ পাই,
মরে বেঁচে—বেঁচে মরে কত কাল থাকিব!"

পিঞ্জরে বিহগী।

চোক বুজিয়া কি ভাবিতেছ ভাই? রাত্রদিন বসিয়া কাহার ভাবনা ভাবিতেছ? কাহারও সঙ্গে মনের কথা বলিতে পার না, কেউ মনের মতন দুটি কথা বলে না, কেউ মনের কথা জিজ্ঞাসা করে না, আবার যে সাধনায় জীবন দিতেছ তাও সিদ্ধ হয় না! আহা তবে ত তুমি বড় দুঃখিনী। তোমার মনের কথা আমার কাছে বল না ভাই? কিসের জন্যে তোমার প্রাণ পুড়িতেছে? তোমার কি নাই? কি হারাইয়া এমন দুর্দ্দশায় পড়িয়াছ? ওঃ! বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি। বিহগ জন্মের সুখ হারাইয়াছ? কপালের সৌভাগ্য হারাইয়াছ, আর সুখের যে মূল সৌভাগ্যের ভাগ্য, জীবনের যে সঙ্গী সেই "যোড়ের বিহঙ্গ" হারাইয়াছ? তা বুঝিয়াছি, তা নইলে, অমন দশা আর

কিসে? অত আগুন আর কিসে? অত জ্বালা আর কিসে?) প্রিয় সখি! আমি তোমার সম দুঃখিনী, আমি তোমার সঙ্গে কাঁদিব, তোমার সঙ্গে সকল মনের কথা বলিব। আমার যে কষ্ট তাহা মানুষের কাছে বলি না—মানুষের কাছে বলিতে পারি না—বলিলে অনেকে বোঝে না। যাহাদের সুখের অবস্থা তাহাদের কাছে বলি না—লজ্জা করে। যাহারা "সেকেলে" ধরণের তাহাদের কাছে বলি না—তাহারা লজ্জা পায়! যাহারা নব্য মহিলা, তাহাদের কাছে বলিনা—পাছে তাহারা বিরক্ত হয়। যাহারা "সুশিক্ষিতা" নাম ধারিণী, তাঁহাদের কাছে বলিনা—পাছে তাহারা পরমার্থ উপদেশ দেয়। যে সকল নবস্ফুট কুসুম কলিকা সমীরণে ঢলিয়া পড়িতেছে সেখানে—তাদের কাছে এ আগুন জ্বালি না—পাছে শুকাইয়া যায়! ভাই! আমি অবলা সত্য, কিন্তু মূক পশুত নই, বিশেষতঃ এখন বলিবার এত কথা হইয়াছে যে তাহা বলিতে বলিতে ফুরায় না—

তবে বল দেখি আমি কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিব? আমি যদি মনের মতন একটি সঙ্গিনী পাই, তাহা হইলে দুটী মনের কথা বলি। ভাই! আমি বড় দুঃখিনী, এ দুঃখের পরিচয় দিবার ক্ষমতা হয় না। আমার কি হইয়াছে? যাহা হইলে বাঙ্গালীর মেয়ের সর্ব্বনাশ হয়, যাহা হইলে লোকের গলগ্রহ স্বরূপ থাকিতে হয়, যাহা হইলে মেয়েদের কাছে "পোড়া কপালী রাক্ষসী" উপাধি পাইতে হয়, আমার তাহাই হইয়াছে। ইহা হইতে আর বুঝাইতে জানি না—আমি যাহা হইয়াছি, তাহা বলিও না, তাহা হইলে বুকের ভিতর বড় ব্যাথা করিবে। (সেদিন আমার একটী ভাই, আমার নাম লিখিবার পরে "উইডো" লিখিয়াছিলেন, আমার বুকে শত বজ্র বাজিল, সেইখানেই কাঁদিলাম—সেই জন্যেই বলিতেছি যে আমি যাহা হইয়াছি তাহা ফুটিয়া বলিও না।) ভাই! এজগতের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় ছিলেন, যাঁহাকে জীবনের বন্ধু বলিয়া জানিতাম, যাঁহার স্নেহে মুগ্ধ হইয়া

পার্থিব জীবনে স্বর্গীয় সুখানুভব করিতে ছিলাম সেই আত্মীয়কে সেই বন্ধুকে সেই সুখের সুখকে চিরদিনের মত হারাইয়াছি, আর এজন্মে পাইব না। আর একদিনও পাইব না এক দণ্ডও পাইব না এক মুহূর্ত্তও পাইব না! জগতের কিছুই যে চিরস্থায়ী নয়, এ জ্ঞানটুকু যদি আগে হইত, তবে কি অত ভালবাসিতে দিতাম? না বাসি· তাম "ভূতেপশ্যন্তি বর্ব্বরা" সে যথার্থ, আমি মূর্খ সে যথার্থ! চির কালই আঁধারে কাটাইলাম, এখনকার শিক্ষিতা ভগ্নীদিগের মত বি এ, এম্ এ, পরীক্ষা দিতে জানি না, স্ত্রী স্বাধীনতার ধার ধারি না; ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোক কাহাকে বলে তাহাও বুঝি না। আমি মূখ। সে সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া, আপনা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তিনি যাহা বলিতেন তাহাই দেব বাক্য স্বরূপ দৈব বাণী স্বরূপ মনে করিতাম। তখন কি ভাবিতে পারিতাম যে আমার ভাগ্য স্বপনের ন্যায়? তখন কি ভাবিতে পারি- তাম মনুষ্য-জীবন জলবিম্ব ন্যায়? তখন কি এ

নিদারুণ ঘটনা স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারিতাম? কখনই নহে। তা ভাই, আমিই যেন মূর্খ তিনি ত কৃতবিদ্য ছিলেন, কত ধর্ম্মোপদেশ দিতে জানিতেন, কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসা পত্র পাইয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়াছিলেন, তা সেই তিনিও ত কোন দিন এ দুর্দ্দিনের কথা ভাবিতে পারেন নাই। এমন যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইবে তাহা তিনি জানিতেন না— জানিলে কাঁদিতেন, আমাকে বুঝাইতেন অথবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি তা জানিতে পান নাই, সেই জন্যই আমার এ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

ভাই বিহগি! তুমি এক সময়ে যেমন কাহারও প্রিয়তমা ছিলে, আমিও সেইরূপ একজনের প্রাণ সদৃশা স্নেহের বস্তু ছিলাম। আমি হাঁটিয়া গেলে তিনি গায়ে ব্যাথা পাইতেন। আমার কদক্ষর পূর্ণ পত্রগুলি পর্য্যন্ত তাঁহার কত ভাল বাসার কত আদরের জিনিস

ছিল। সেইসব পত্র তিনি সবুজ ফিতায় বাঁধিয়া আয়নার বাক্সের ভিতর পুরিয়া রাখিতেন, আমি তাহা দেখিয়া মনে মনে কত হাসিতাম। সেই সকল পত্র—তাঁহার প্রিয় পত্রিকা সকল লোকে নাকি আগুন জ্বালিয়া পোড়াইয়া ফেলিয়াছে। অত যত্নের পরিণাম এই হইয়াছে। আমার সেই স্বর্গ সুখের পরিণাম এই নরক যন্ত্রণা হইয়াছে। তা ভাই! আমার মরণ হয় না, কত ইন্দ্র চন্দ্র খসিয়া পড়িতেছে, কত সোনার কলম আগুণে পুড়িতেছে, কিন্তু আমার মরণ হয় না। এতেইত মনে পড়ে, যে সকল মহাত্মারা সহমরণ প্রথা নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ভারি মহত্ব বড় পুন্য কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন, অক্ষয় কীর্ত্তি জাগরূক থাকিবে, স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে অধিকার পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই, এক দিন দগ্ধ আর চির দিন দগ্ধ! সতী-দাহ-নিবারক দিগের দয়ার শত ধন্যবাদ! অবলা বলিয়া যিনি যা করেন সবই শোভা পায়। আমাদের

ভাই বল্‌ছি, ভাই বিহগি, যদি মরণই না হয়, আবার যদি এ জগতে থাকিতে হয়, তা এ সকল কাহিনী ভুলিয়া সংসার ধর্ম্মে মন দিই না কেন? আমার সংসার ধর্ম্ম কার জন্যে?—দেখিলে ভাই, কি পাপিষ্ঠ মন দেখিলে ভাই? ধর্ম্ম যে আপনার জন্যে। ঈশ্বরকে ডাকিব না, তাঁহার নাম করিব না, তবে মুক্তি পাইব কিরূপে? ঈশ্বর আমার পিতা, ঈশ্বর আমার মাতা, ঈশ্বর আমার বন্ধু, ঈশ্বরকে ডাকিব না কেন? তা এই কি পিতৃ মাতৃ স্নেহ? সন্তানকে এমন আগুণে পোড়ানো কি মা বাপের কায? হয়ত পরকালে ঈশ্বর কৃপা করিবেন, যাঁহার জন্যে ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিতে ভয় করিতেছি না, তাঁহাকে হয়ত পরকালে পাইব—না না এ যে স্বার্থপূর্ণ কথা! আপনা ভুলিয়া ঈশরকে যদি ভাল না বাসিতে পারিলাম, তবে এ নারী জীবনে শত ধিক্! ঈশ্বরের বস্তু আবার ঈশ্বর গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আমার দুঃখ কি? যিনি দিয়াছিলেন

তিনি লইয়াছেন, আমি কে? আমার কি? ঈশ্বর কি দান করিয়া হরণ করেন? আমরা দান করিয়া হরণ করিলে মহা পাপ হয়, ঈশ্বরের পাপ হয় না কেন? একি প্রশ্ন! আমরা মনুষ্য, ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করা আমাদের পাপ, ঈশ্বরের ত আর ঈশ্বর নাই, তাঁহার বিবেচনা মত যাহা হইতেছে, তাই করিতেছেন। ঈশ্বর আমাকে দান করেন নাই। পৃথিবীতে থাকিতে হইলে একটী সঙ্গী আবশ্যক বলিয়া মানুষে দিয়াছিল, তাহাই ঠিক্। তবু ঈশ্বর দায়ী, আমার যে দিন বিবাহ হইয়াছিল, সেদিনকার কথা ত ঈশ্বর জানেন। সেই সকল পাঠ্য মন্ত্র, সেই সকল প্রতিজ্ঞা ত ঈশ্বর জানেন। আমার জীবনের সুখ সচ্ছন্দতা ভরণ পোষণ প্রভৃতি সমস্ত ভার যাঁহার হস্তে সমর্পণ হইল, তাঁহাকে, কি বুঝিয়া ঈশ্বর অপহরণ করিলেন? আমি জীবিতা থাকিতে ঈশ্বর কেমন করিয়া তাঁহাকে অপহরণ করিলেন? তিনি ঈশ্বরকে অত ভক্তি করিতেন, কত লোকের উপকার করিতেন, কত

মুমূর্ষুর জীবন দান করিতেন, কত সৎকার্য্য করিয়া পিতা মাতার মুখোজ্বল করিতে পারিতেন, আত্মীয় বন্ধুদিগকে কত সুখী করিতে পারিতেন, আমার এ হতভাগিনীর ত কথাই নাই। তবে ঈশ্বর এত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে লইলেন কেন? লইবার কি আর লোক ছিলনা—আমি মরিলে ঈশ্বরের বা জগতের কি ক্ষতি হইত? যাহারা বার্দ্ধক্য জনিত-কষ্টে জীবন দুর্ভর মনে করিতেছে, যাহারা জীবন ত্যাগের জন্যে ঈশ্বরের পায়ে মাথা খুঁড়িতেছে, তাহাদের জগতে রাখিয়া ঈশ্বর নিন্দার ভাজন হইতেছেন কেন? এ সকল কি "পরম কারুণিক পরমেশ্বরের" কর্ত্তব্য কায? বল দেখি ঈশ্বরকে কেমন করিয়া পিতা মাতা—কিম্বা তদপেক্ষাও অধিক মনে করি।

ভাই বিহগি! এমন করিয়া মুখ ফিরাইলে কেন? অপকারীর ও উপকার করা উচিত, শত্রুকেও ভালবাসা উচিত, তা ঈশ্বর কে ভাল বাসিতে চাহি না কেন? ভাবিতেছ নাকি

"সেবাতেই মহত্ব" অপরে আমাকে ভাল বাসুক বা না বাসুক সহস্র অপকারই করুক, "আমি প্রাণ ভরিয়া তাহাকে ভাল বাসিব ও তাহার সেবা করিব" এইরূপ ভাবিয়া সেবা করাই মহৎ মনের কার্য্য, ইহাই আদর্শ রমণীর কর্ত্তব্য। তা আমি পারিতাম—মন যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন হৃদয় যতই অবনত হউক না কেন ঈশ্বরকে দয়াময় ভাবিতে, ঈশ্বরকে আপনার জন ভাবিতে অবশ্যই পারিতাম। যদি ভাই, তাঁহাকে ভুলিতে পারিতাম—যাঁহার জন্যে এ পাপিষ্ঠ কথা মনে স্থান দিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাঁহাকে যদি ভুলিতে পারিতাম, তবে আর কি? তাঁহাকে মনে করিলে এই নিদারুণ ঘটনা মনে করিতে হয়, সেই জন্যেই বলিতেছি যে তাঁহাকে যদি ভুলিতে পারিতাম, তবে সবই পারিতাম। ঈশ্বরকে দয়াময় ভাবিতে পারিতাম, পতিপ্রেম অনন্তপ্রেমে মিশাইতে পারিতাম, ঘর সংসার আমার ভাবিতে পারিতাম, পাঁচ জনের সুখে হাসিতে পারিতাম, সবই পারিতাম। তা

ভাই! তাঁহাকে কেমন করিয়া ভুলিব ? যা কিছু দেখি শুনি সব তাতেই যেন তাঁহার—যাঁহাকে ভুলিতে চাহিতেছি, তাঁহারই যেন কি আছে। আকাশের চাঁদে আছে, বনের ফুলে আছে, শীতল বাতাসে আছে, প্রবাহিনীর তরঙ্গে আছে, বসন্তের শোভায় আছে, বর্ষার মেঘে আছে, কোকিলের গানে আছে, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে আছে, মানুষের হাসিতে আছে, ব্যথিতের কান্নায় আছে, লোকালয়ের উৎসবে আছে, বিজনের নিস্তব্ধতায় আছে, আর আমার মনে প্রাণে হৃদয়ে শোণিতে এবং শিরায় শিরায় ব্যাপ্ত আছে, তবে বল দেখি ভাই, তাঁহাকে কেমন করিয়া ভুলিব ? কাহাকে ভুলিব ? যিনি সেই—যিনি আমার সব ! হরি ! হরি ! কাহাকে ভুলিব—তাঁহাকে ভুলিব ! তাঁহাকে ভুলিব ! 'আমি' দূরে থাক্—কেউ পাছে তাঁহাকে ভুলিয়া যায় সেই ভয়ে মর মর হয়ে থাকি। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আমাকে যতদিন লোকে দেখিবে, কেউ

তাঁহাকে ভুলিবে না—আমাকে দেখিলেই তাঁহার কথা মানুষের মনে জাগিবে। তবে আমি মরিব কেন? তাঁহার স্মরণার্থেই আমি বাঁচিয়া থাকিব।

এক সময়ে লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে। কেনই বা না ভুলিবে? তিনি ত নেপোলিয়ান বোনাপার্টির মত বিক্রমশালী নন, শ্যামসনের মত বলিষ্ঠ নন, সেক্স্পিয়রের মত কবি নন এবং হর্কিউলিসের মত অসম্ভব ক্ষমতাপন্ন নন, তবে কেন লোকে তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না? তিনি যা তা, যে সে লোকে বোঝে না—সে বনের ফুল বনেই ফুটিয়াছিল, সে সৌরভ বহনে সমীরণই কৃতার্থ হইয়াছিল! সে মণি রাজমুকুটে শোভা পায় নাই, ললনার ললিতাঙ্গে শোভনীয় হয় নাই, সুধু খনি গর্ভই আলোকিত করিয়াছিল! অপক্ষপাতী সত্য কথায় কল্পনা শূন্য বর্ণনায়—একাধারে তাঁহার মত কয় জন আছে? সে অলৌকিক সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া দেবতারাই অমরাক্ষরে সে জীবনচরিত লিখিবেন,

সেই অপার্থিব গুণালঙ্কৃতকে দেবতারাই যোগ্য আসন প্রদান করিবেন। (মানুষের নিকটে, মর জগতে তিনি কিছুই যাচ্ঞা করেন নাই) কিন্তু মানুষে তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে। কত বিক্রমাদিত্য মাটি হইল, কত কালিদাসের নাম ডুবিল, কত যুধিষ্ঠির বায়ুতে মিশিল, কত কীর্ত্তি স্তম্ভ সমভূম হইল, তবে তিনি চির-স্মরণীয় কিসে হইবেন? যাহা হউক যদিও লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া যায়, তাহা বোধ হয় আমার জীবন থাকিতে নহে। আমার এ দুর্ভর জীবন আর কতদিন বহন করিতে হইবে? জীবনের অষ্টাদশবর্ষ অতীত হইয়াছে, আর কতদিন বহন করিতে হইবে? "দুঃখীর জীবন দীর্ঘস্থায়ী" সকল দিকেই চিত্র!

ভাই বিহগি! তোমার মত আমারও কেবল বনে যাইতে ইচ্ছা করে। মানুষের মুখ দেখিতে আর ইচ্ছা হয় না—মানুষে আমার কোন ক্ষতি করে নাই, তবু ভাই মানুষের নিকট মুখ দেখাইতে যেন কেমন কেমন হয়।

তবে মনের মতন মানুষ পাইলে একটু তৃপ্তি লাভ করি। সেই সব কথা যাহারা বোঝে, যাহারা জানে, যাহারা মনের মতন উত্তর করে, তাহাদের বড় ভাল বোধ হয়। সেই সব কথাই শুনিতে পারি, সব কথাই বলিতে পারি, কিন্তু একটি কথা ভাবিতেও পারি না, ভাই, সে তাঁহার শেষ পীড়ার কথা—সে কথা মনে পড়িলে মন যে কেমন হয়, তা আর কি বলিব ? মানুষের ভাষা প্রাই পাঁকে পড়ে, শরীরের যেখানে ব্যথা হয় সেই খানেই আঘাত লাগে। যে কথা মনে হইলে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয় সেই কথাই সর্ব্বদা মনে পড়ে। মনে যে কত কথা জাগে ভাই, এগার বৎসরের কথা দুএক দিনের নয়! কতদিন এরূপ অবস্থায় থাকিব ? এ উত্তর আর কে দিবে—ভগবান জানেন !

প্রিয় বিহগি! তুমি কি গান করিতেছ ? আমি যে গান বড় ভাল বাসি, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে ? "অনাথিনী জানে সখি অনাথিনী বেদনা" দুঃখের প্রাণে মনের মতন

গান যে কত তৃপ্তিকর, প্রদীপ্ত শোকানলে গান যে কি সুধার প্রবাহ তাহা তুমি অবশ্যই জানিতেছ। বিহগি! আমাদের দুজনের এক অবস্থা হইয়াছে, আজি হইতে তুমি আমার "সই" হইলে! যখন এ প্রবাহিনী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইবে তখনই তোমার নিকটে আসিব, অমনি মধুর স্বরে আমায় জুড়াইও। এত ভাল বাসাবাসি হইল, দুজনে নূতন সম্বন্ধ পাতাইলাম, তা প্রণয়োপহার কিছু দেওয়া হইল না—ভাই! প্রণয়ের মূল্য নাই!

কি আছে আমার আর, দিতে তোরে উপহার,
বড় অভাগিনী বিভু করেছে আমারে,
যদিরে নয়ন জল, হইত মুকুতা-ফল,
গাঁথিয়া চিকণ মালা দিতাম তোমারে!

মরুভূমে মরীচিকা।

এই ঘরটি আমার শয়ন ঘর। পুষ্পোদ্যানের মধ্যে যেমন গোলাপফুল, পক্ষী জাতির মধ্যে যেমন স্বর্গীয় পক্ষী, জ্যোতিষের মধ্যে যেমন শশধর, পৃথিবীর মধ্যে যেমন জন্মভূমি, এই বাড়ীটির মধ্যে এই ঘরটি আমার সেইরূপ। কিন্তু সে এখন নয়, অনেক দিনের কথা—কি অল্প দিনের কথা, ঠিক্ মনে হয় না; এক্‌বার মনে হয় যুগযুগান্তরের কথা, একবার মনে হয় যেন এই সে দিনকার কথা—এক সময়ে এই ঘরে শরতের চাঁদ সুধার হাসি হাসিত; এই ঘরে বসন্তরাজ শোভা ছড়াইতে আসিত, বর্ষার জলধর পীযুষ-ধারাবৎ বৃষ্টি শব্দ শুনাইত, সমীরণ মধুর হিল্লোলে শরীর যুড়াইয়া বহিত! বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের ন্যায় এই ঘরের কেমন একটি গুণ ছিল, এই ঘরে আসিলে

আমি স্বর্গ সুখও তুচ্ছজ্ঞান করিতাম, এই ঘরের মোহিনী কুহকে ভূত ভবিষ্যত ভুলিয়া থাকিতাম! কিন্তু তখনকার সময়ে আজিকার মত একাকিনী থাকিতে হইত না। (তখন এ ঘরে—আমার কাছে থাকিবার একজন লোক ছিলে না। সূর্য্যের কিরণে চন্দ্রমা যেরূপ জ্যোতিষ্মান হয়, সেইরূপ তাঁহার জন্যেই এ ঘর "ইন্দ্রালয়" ছিল।) একদিন এই ঘরে কত হাসি হাসিয়াছি, কত মনের কথা বলিয়াছি, কত আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, বিছানায় কত সুগন্ধি দ্রব্য ছড়াইয়াছি, এবং এই ঘর কত করিয়া সাজাইয়াছি। তখন যে ঘর অনন্ত সুখের আগার ছিল আজ সেই ঘর অনন্ত দুঃখের আগার হইয়াছে; পক্ষী হীন পিঞ্জরের ন্যায়, পুষ্পহীন বৃন্তের ন্যায়, শিশুহীন মাতৃক্রোড়ের ন্যায় পতিহীনা বিধবার ন্যায়, জীবন হীন শবের ন্যায় এ ঘরটি যেন কি হীন হইয়াছে! তখন যে ঘরে আসিলে না হাসিয়া থাকিতে পারিতাম না, এখন সেই ঘরে আসিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। স্মৃতি সহস্র

চক্ষে অতীত ঘটনা সকল পুনর্দ্দর্শন করাইতে থাকে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে শেল বিদ্ধ হইতে থাকে। যে কালে আমার "সুখের সময় ছিল, যখন আমি দশ জনের একজন ছিলাম, তখন সকলেই আমার সুখ বাড়াইত হাসাইত; এখন কেহই আমাকে দুঃখ দিতে ছাড়ে না—সকলেই কাঁদায়—চাঁদ কাদায়, সমীরণ কাঁদায়, কুসুম সুন্দরীরা কাঁদায়, শ্যামাঙ্গী যামিনীদেবী কাঁদায়, এই ঘরটীও কাঁদায়—সেকালে যাহাদের সঙ্গে বড় ভালবাসা ছিল, তাহারা সকলেই কাঁদায়! কেমন করিয়া কাঁদায়?—আমাকে গালি দেয় না মারে না, তবে কেমন করিয়া কাঁদায়? যে কথা শুনিলে আমি কাঁদি—আমার কান্না আইসে, তাই যে বলে! মরমে মরমে যে শেল ফুটাইতে থাকে, তবে আমি না কাঁদিয়া কি করিব? "অসময়ে কেউ কার নয়" ইহা যে প্রবাদ মাত্র নহে, এতদিনে তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম, লোকে দায়ে না ঠেকিলে কিছুই শিখে না!

আমি যখন সেই সৌভাগ্য-কমলার-কৃপা-পাত্রী ছিলাম, তখন একজন আমাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতিকে আমার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে দিতেন না, এখন সেই একজন আমাকে ঘোর অরণ্যে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছেন, চির-দিনের মত কোথায় পলায়ন করিয়াছেন—কে তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে, আমাকে অসহায়া অবলা পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বিপক্ষগণ প্রবল অত্যাচার করিতেছে, সর্ব্বস্বহীনা দেখিয়া জীয়ন্তে মর্ম্ম যন্ত্রণা দিতেছে! হায়রে এদুঃখ আর কাহার কাছে বলিব ? এ দুঃখের প্রতি-বিধান আর কে করিবে ? আমার দুঃখে আজ কাহার বুক ফাটিয়া যাইবে! কাহার নিকটে বলিলে এ যন্ত্রণার শান্তি হইবে! বিধাতঃ! এ কপালে কি লিখিয়াছিলে! কেমন করিয়া লিখিয়াছিলে ? তুমি কি এমন নিষ্ঠুর !

(এই যে রাত্র ২টা বাজিল। জগৎ নীরব। সকল জীব জন্তুই স্নেহময়ী নিদ্রা-জননীঅঙ্কে

সুষুপ্তি লাভ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আকাশে এক একটা বিকটাকার পক্ষী উড়িয়া যাইতেছে, থাকিয়া থাকিয়া ঝিল্লিপোকা ঝন্ ঝন্ করিতেছে আর শৃগালগণ "হোয়া হোয়া" চীৎকার করিতেছে। আমাকে হতভাগ্যা দেখিয়া নিদ্রাদেবী ও পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই এ গবাক্ষে বসিয়া কাঁদিতে হইতেছে; ঈশ্বর ত আমার কষ্ট অবলীলাক্রমে সহ্য করিতেছেন আমার অদৃষ্টে ত কোন প্রত্যাদেশ হয় না—নাটক নভেলে এত দৈবানুগ্রহ দেখিতে পাই, "দৈববাণী দৈববাণী" এত শুনিতে পাই, আমার পোড়া-কপালে ত কিছুই জোটে না। তা হবেই বা কেন— পাপিষ্ঠ কপাল কি না! আচ্ছা, এইত বসিয়া আছি, জগদীশ! পতিত পাবন! অধম তারণ! আমাকে অনুগ্রহ কর; একবার কোন রূপে আমাকে বল যে পরলোক আছে, তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বত্রে বিদ্যমান আছ, বল যে; মরিলে ও চরণে আশ্রয়ে পাইব, পরলোকে মিলিতা হইব, বল যে স্বামী আমার জন্যে অপেক্ষা করিতেছেন!

জগদীশ! এক বার বল, আর আমার সয় না!

এই ত বসিয়া আছি, কই?—ঈশ্বর বলিলেন কই? আচ্ছা, এখন যদি দেখিতে পাই এই ঘরে, ঐখানে কেহ দাঁড়াইয়াছে, জিজ্ঞাসা করি তুমি কে গা? উত্তর নাই। কিছু নিকটে যাইয়া দেখি যেন একটী জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী; নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করি, ও মা। তুমি কে মা? তোমার আবাস স্থান কোথায় মা? এমন সময়ে এখানে কেন গা মা? রমণী শ্রুতি তৃপ্তকর মধুরস্বরে উত্তর করিলেন "আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী, তুমি এত রাত্রে কাঁদিতেছ কেন? ওমা! এত রাত্রে কেন কাঁদি, তা কি বলিব মা? কি বলিয়া সে কথা বলিতে হয়, তাহা ত জানি না মা। ওমা! আমার যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে—আমার কপাল যে পুড়িয়া গিয়াছে, কি ছিলাম কি হইয়াছি, কি যে হারাইয়াছি—সিঁদুর টুকু—ওমা, সে যে সিঁদুর টুকু—আমি আর ও কিছু বলিতাম, কিন্তু রমণী ভঙ্গ দিয়া বলিলেন "তা বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবেনা, তা এমন

করিয়া কাঁদিলে কি হইবে?” ওমা! কাঁদিলে কি হইবে তাত জানিনা, ভুলিতে পারিনা, তাই কাঁদি, বুকের ভিতর ফাটিয়া যায় তাই কাঁদি, না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না তাই কাঁদি, চোখের জল পড়ে তাই কাঁদি—আমার কথা শেষ না হইতেই রমণী কহিলেন,—স্নেহময়ী সস্নেহে কহিলেন “বাছা! তোমার কান্নায় আর ত তিষ্টিতে পারি না—এখন হইতে তোমার আর কাঁদিতে হইবে না” সে কি গা মা? আমি যে চিরদিনই কাঁদিব, এ রোদনের যে শেষ নাই—অসমাপ্ত বাক্যে ভঙ্গ দিয়া সুন্দরী কহিলেন “আর তোমায় কাঁদিতে হইবে না, আমিই তোমার সকল দুঃখ দূর করিব” ওমা! এ যে ছেলে ভুলানো কথা হলো। এদুঃখ কেমন করিয়া দূর করিবে মা? এদুঃখ দুর করিবার যে উপায় নাই! সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন “দুঃখ দূর হইবে না? অবশ্য হইবে। যাঁহার জন্যে এমন করিয়া মরিতেছ, তাঁহাকে যদি আবার পাও?” ওমা! সে কি কথা মা? তাঁহাকে!—হরি! হরি! আবার তাঁহাকে — তাঁহাকে আবার!— তামাসা?

হঁ্যা মা, একি তামাসা! কি বোল্‌চো মা— আমি কি পাইব? "তামাসা নয়, তামাসা নয়, তাঁহাকেই পাইবে" ওমা আবার! আবার!— কোথায়? কি রূপে?—এই জন্মে? এই জীবনে? "অত ব্যস্ত হইও না, আমার সঙ্গে আইস" ওমা! এখনই যাইব, সে কত দূর? হঁ্যা মা, সে কত দূর? মাথা ঘুরিতেছে, গা কাঁপিতেছে—ওমা চল। "তবে এস"।

আজ আমার গতি কে রোধ করিবে? যদি স্রোতস্বতীর বেগ ফিরাইতে সক্ষম হও, যদি কালের গতি রোধ করিতে সক্ষম হও, যদি সুরাপায়ী উন্মত্তকে সুস্থির রাখিতে সক্ষম হও, তত্রাচ আজ আমাকে কেহই গৃহে আনিতে পারি না। আমি যাইতেছি—কি অবস্থায় যাইতেছি? উপমা নাই। এমন ভাগ্য কোন পুরুষের কি রমণীর হয় নাই—আমিই প্রথম, আমারই নূতন। অর্‌ফিয়্‌স যমালয় পর্য্যন্ত গিয়া ছিলেন, সাবিত্রী সত্যবানের পুনর্জ্জীবন দেওয়াইলেন,

কিন্তু আমার সঙ্গে তাঁহাদের উপমা হয় না! যেদিন নির্ব্বাসিতা সীতা রাম চন্দ্রের সভায় যাইতেছিলেন যেদিন ব্রজাঙ্গনা প্রভাষ যজ্ঞে নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন, যেদিন বিষ্ণুপ্রিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে পতি সন্দর্শনে যাইতেছিলেন, সেদিন তাঁহাদের মনের যে রূপ অবস্থা, আজি আমার মনেরও সেই অবস্থা। সে কি অবস্থা? তাহা ত বলিতে জানি না। ভগিনি! তোমার যদি কোন মূল্যবান বস্তু হারাইয়া থাকে, তাহা আবার যদি পাইবার আশা পাও, তবে আমার অবস্থার ছায়া তোমার মনে প্রবেশ করিতে পারিবে। ছায়া বলিতেছি কেন? তোমার মূল্যবান বস্তু—আমার অমূল্য জীবন। না পাইলে তোমার অন্ন মারা যায় না, না পাইলে আমার ভিক্ষা করিতে হয়। যাঁহার অভাবে কালামুখী হইয়াছি, যাঁহার অভাবে পোড়া-কপালী হইয়াছি, যাঁহার অভাবে একবারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছি আজ তাঁহাকে পাইব! এই আমি সেই আমি হইব! এই

মরুভূমে নদী প্রবাহিত হইবে! হরি। হরি ঐ স্বর্গ না এই স্বর্গ! আর থাকিতে পারিলাম না, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "আর কতদূর?" অগ্রগামিনী উত্তর করিলেন "এখনই যাইবে, অত ব্যস্ত হইতেছ কেন?" হরি! হরি! হাসিব না কাঁদিব? "অত ব্যস্ত হইতেছ কেন?" অতব্যস্ত কেন হইতেছি তাহা কাহার কাছে বলিব? এ ব্যাথার ব্যথিতা ভিন্ন কে বুঝিবে এত ব্যস্ত হইতেছি কেন? যাক্ উঁহার কাছে আর বলিব না, পাছে রাগ করেন, পাছে শাঁপ দেন পাছে "পুনর্মুষিকোর্ভব" করেন!

বাটী ছাড়িয়া কতদুর আসিয়াছি, তাহা বলিতে পারিনা। এই রাত্রে চন্দ্রলোকে পৃথিবীর কেমন শোভা হইয়াছে বলিতে পারি না, আমার চক্ষু স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে আর চায় না। এই যে সম্মুখে নদী দেখিতেছি; নদীর মধ্যে চাঁদ কেমন রঙ্গে খেলিতেছে কেমন ভঙ্গিমায় তরঙ্গ নাচিতেছে, তাহাতে আমার কায কি? আমার যে কথায় আবশ্যক, তাহাই জিজ্ঞাসা

করি, হ্যাঁমা, আর কত দূর ? মধুরভাষিণী প্রসন্ন-মুখে কহিলেন "এই নদীর মধ্যে নামিয়া আইস" —আজ আমার ভয় করিতেছে না, অভয়মূর্ত্তি যাহার মনে জাগরূক, তাহার আর ভয় কিসে ? সাগ্রহে নদীর জলে নামিলাম ; নামিলেই ইষ্টক-নির্ম্মিত সোপান চরণস্পর্শ হইল। সুহাসিনী সহাস্য-মুখে কহিলেন "এই যে সিঁড়ী দেখিতেছ ইহা পাঁচ শত। এই সিঁড়ী ছাড়াইলে যে মন্দির দেখিবে, তিনি সেখানেই আছেন।" এতক্ষণের পর আশায় ভরসা হইল। শরীর যেন অবশ হইতে লাগিল—কিন্তু সরল দেহ—কে না জানে স্ফূর্ত্তি জন্মিলে চিররুগ্ন ব্যক্তিও সরলতা প্রাপ্ত হয়। যাঁহাকে দেখিতে যাই-তেছি, তিনি কেমন আছেন কি করেন জানিতে বড় ইচ্ছা হইল—সহসা সবিশেষ কেমন করিয়া জিজ্ঞাসা করি ? দশবার ইতঃস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁ মা ! তিনি কি আমা-দের মনে করেন ? সঙ্গিনী গম্ভীরভাবে কহিলেন "এখনই জানিতে পাইবে" এ উত্তরে কে সন্তুষ্টা

তিনি মনে করেন না?—তা
পোড়া কথা কেন? আমার মত
র নিকট কিরূপ উত্তর করিতে হয়,
া দেবী জানেন না। যাহাই হউক দ্বিতীয়
প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না।

এই যে একশত সিঁড়ী ছাড়াইলাম, আর চারিশত সিঁড়ী ছাড়াইলে হয়। আহা রে! পথ যদি আর একটু সরিয়া আসিত! আর কতক্ষণ পরে যাইব? সেই মন্দিরে গিয়া যদি দেখিতে পাই—পোড়া মনের ঐ ত দোষ! "যদি" আবার কেন? নিশ্চয়ই দেখিব। সুখ দুঃখ ত চক্রাকারে ভ্রমণ করিতেছে, তা আমি চিরদিন এ সাগরে ডুবিয়া থাকিব কেন? আচ্ছা তাই হউক, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে কি করিব? কি আবার করিব? সেই চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিব, যতক্ষণ আমাকে আর কাঁদাইবেন না বলিয়া দিব্য না করেন, ততক্ষণ চরণ ছাড়িব না—তা তিনি মাথার দিব্য দিলেও না। এত যে কষ্ট দিয়াছেন, তাতে ত একটু

রাগ করিতে হয়। দূর! সে আজ আবার রাগ! আমাকে কষ্ট।.. কখন সুখে আছেন? আজিকার সমস্ত রা।. দুঃসহ দুঃখের কথা বলিয়া কাটাইব! কত কাঁদিবেন আর কতই কাঁদিব! এত দিন যে কাঁদিয়া মরিয়াছি, সেই কান্না আজ সফল হইবে।—“এখনই জানিতে পারিবে” দেবী ও কথাটা কেন বলিলেন? উহার অর্থ কি? তিনি এখন কেমন হইয়াছেন? তাহাই বা কে জানিবে? আমাকে যদি দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন?—তা দিলেনই বা, তবু ত তাঁহাকে দেখিতে পাইব। তবু ত সেই পায় ধরিয়া কাঁদিতে পাইব; তাই বা কেন ভাবি—তিনি কীট নয় ত, পুষ্প—সে মনে মলিনতা নাই ত, পবিত্র আলোক—সে হৃদয়ে গরল নাই ত, অমৃত—সে প্রাণে নিষ্ঠুরতা নাই ত, স্নেহ—সে তাঁহাতে আর কিছু নাই ত, কেবল আমি! তিনি দেবতাই হউন, গন্ধর্ব্বই হউন, উপদেবতাই হউন, কি আর কিছু বা হউন, তিনি ত আমারই

—আমাকে গ্রহণ করিবেন না কেন? পোড়া মনের উপর ঐ দোষেই ত রাগ হয়!

তেমন আকৃতি আহা!
ভাবিয়ে ভাবিয়ে যাহা
আনন্দ বিষাদে মত্ত পাগল পরাণ!
সে কি গো এমন হবে
মোর দুঃখে সুখে রবে
কাঁদিয়া ধরিলে কিরে. ফিরাবে বয়ান!

এইবার চারিশত সিঁড়ী ছাড়াইলাম। এত দিনের পরে অনাথ বন্ধু অনাথিনী বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন।) আমার এ অবস্থা দেখিলে—যাঁহার জন্যে এ অবস্থা হইয়াছে তিনি আজ এ অবস্থা দেখিলে কি করিবেন? না জানি কত ব্যাথাই পাইবেন! আহা রে! যখন চারি চক্ষু একত্রে মিলিবে সে সময়টা কেমন!—আজ আমার মত সুখী কে? আজ কাহাকে পাইব? আমার হৃদয়-খণির যে মণি প্রণয়াকাশের যে চন্দ্র, মনোরাজ্যের যে রাজা জীবনের যে জীবনী-শক্তি আজ তাঁহাকে পাইব!

দুর্গা দুর্গা! আজ কাহাকে পাইব? যাঁহার জন্যে আমার সংসার, যাঁহার অভাবে আমি ভিখারিণী, যাঁহাকে পাইলে আমি রাজ-রাণী যাঁহার জন্যে আমার জীবন, তাঁহাকেই পাইব! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আজ কাহাকে পাইব? সেই যে জানালায় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সেই যে আর দেখি নাই, সেই যে হারাণ রত্ন, সেই যে নামটি মনে এসে মুখে এসে না, লিখিতে পারি পড়িতে পারি না, বলিতে জানি বলিতে পারি না, আগে যা শুনিলে হাসিতাম, শেষে কাঁদিতাম, এখন হাসিতেছি কাঁদিতেছি, সেই সকলের যে মূল আজ তাঁহাকেই পাইব! হরি! হরি! হর্ষে সর্ব্ব শরীর-রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সুখই সুখের অনুবন্ধন করে, এমন সময় সঙ্গিনী ডাকিয়া বলিলেন "এই যে, সত্বর হও, আর পাঁচটি সিঁড়ী" প্রাণের ভিতর—প্রাণের মর্ম্মে কথাটি বাজিল, হৃদয়গ্রন্থি খসিয়া পড়িল, অন্তঃস্তল ঘূর্ণিত হইল, বায়ু যেন কাণে কাণে বলিল "সত্বর হও, আর পাঁচটি সিঁড়ী!" আকাশ যেন

প্রতিধ্বনিত হইল। আমার পা যেন খসিয়া পড়িল——দরিদ্রের কপালে কখন রাজ-ভোগ হয় না, আমি সেইখানেই মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম!

(কতক্ষণ পরে——জানিনা কতক্ষণ পরে আমার অঙ্গে শীতল কর স্পর্শ হইল। জগদীশ! জগদীশ! এ হস্ত কাহার? আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম দেখিয়া কে দৌড়িয়া আসিয়াছে? কাহার আসন টলিয়াছে? কাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে? কে সহস্র কর্ম্ম ফেলিয়া আমার শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছে! হস্তখানি সবলে ধরিলাম পাছে আবার হারাইয়া যায় সেই ভয়ে সবলে ধরিয়া চক্ষু মেলিলাম—হায়! হায়! হায়রে! এযে সবই ফাকি! এযে নগেন্দ্রমোহিনীর হাত!! এযে সেই ঘর! এ যে সেই গবাক্ষ! হায়রে সবই যে-ফাকি! এখনও আমার সর্পাঘাত হইলনা! এখনও বজ্রাঘাত হইলনা! /এখনও প্রাণ যায় নাই! আজ মরিব, নিশ্চই মরিব, ঈশ্বরের উপর স্ত্রী হত্যার পাপ দিয়াই মরিব)

ব্যাকুল ভাবে উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলাম "মা পৃথিবি! অধমা সন্তানের জন্যে আজ একবার বিদীর্ণ হও মা, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি, এ মরু-ভূমে মরীচিকার ছলনা, আর সয়না" হায়রে! পৃথিবীও আমার কথা শুনিলনা—সেকালের পৃথিবী এখন নাই—আমার কপালেই মৃত্যু হয় নাই!

এত দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যে শান্তি টুকু পাইতেছিলাম আজি তাহা সমূলে হারাইলাম একেই বলে

"দুর্ভাগ্য বণিক! আহা আশার ছলনে,
যা ছিল সম্বল কিছু, ঠেলিলে চরণে!" !!

অরণ্যে রোদন।

উহুহু কিসের দায়
পরাণ পাগল প্রায়
উচাটন মন সদা আকুল হৃদয়,

অরণ্যে রোদন।

কি যেন হয়েছে আহা!
যা চাই না পাই তাহা
কি ভাবে যে এত ভাবি সুধিব কাহায়।
কিবা দিবা কিবা নিশি
বিজন-কাননে আসি
বিরলে নয়ন-জলে বদন ভাসাই,
কি শেল বেজেছে প্রাণে
বলিনে তা কারো সনে
আপনি অনল জ্বালি, আপনি নিবাই!
শূন্য প্রাণ শূন্য মন
শূন্য জন-নিকেতন
সব যেন শূন্যময় যা হেরি নয়নে
কে যেন অনল জ্বেলে
সুখ শান্তি দেছে ঢেলে
চির-জনমের মত, জ্বলন্ত দহনে!

৩

অঙ্কুর উদয় হ'ল
নব পাতা দেখা দিল
হ'ল ডাল—হল ক্রমে কলিকা উদয়

ফুটিতে ফুটিতে ফুল
বাজিল বিষম শূল—
পড়িল দারুণ বাজ তরুর মাথায় !

৪

আর কেন, সব হলো—
সব হ'তে শব হলো—
ফুরাইল আশা তৃষা সাধ আকিঞ্চন—
ছিঁড়িল ফুলের মালা
ভাঙ্গিল সাধের খেলা
কমলে পশিল কীট—নাশিল জীবন !

৫

——তবু ত বোঝেনা মন
তাই কর অনুক্ষণ
শয়নে অশনে সা[illegible] সে ভাবে মগন,
ভুলে যদি থাকি ভুলে
কে যেন তা দেয় তুলে
যেন কি ঘুমের ঘোরে হেরি সে স্বপন !

৬

সহসা চমকি শেষে
শিশু যথা স্বপ্নাবেশে

প্রাণ ভোরে মন খুলে কাঁদিবারে চাই
অভাগ্য-ভাগ্যের বলে
তাওরে ঘটেনা ভালে
বোবার স্বপন যথা ফুকারিতে নাই !

৭

যে দিন গিয়াছে ফিরে
আর তা আসিবে কিরে—
না না না গিয়েছে ভেঙ্গে সে সুখস্বপন—
যেদিন গিয়েছে আহা,
আর না আসিবে তাহা
গিয়েছে গিয়েছে সব জন্মের মতন !

৮

সিন্ধু মথি সুধা আশে
হলাহল লাভ শেষে
প্রত্যক্ষে ফলিল তাই আমার কপালে !
উহুরে পরাণ মন
জ্বলিছে যে হুতাশন
নিবিবে না এ অনল থাকিতে ভূতলে !

৯

কেন রে সৌরভ-বহ !
বহিছ, মানব দেহ
কেন রে এমন জ্বলে তব পরশনে ?
কেন গো প্রকৃতি দেবি !
এহেন বিষণ্ণ ছবি—
তুমি মা কিসের দুখে কাঁদিছ বিজনে !

১০

শশী নিশি গ্রহ তারা
কি লাগিয়ে কাঁদে তারা
কার তরে কুমুদিনী ব্যাকুল হৃদয় ?
তোমার চরণ ধরি
সুধাংশো ! বিনয় করি,
কাল্ হতে আর তুমি হওনা উদয়—

১১

সুধাহীন সুধানিধি
বিধির কেমন বিধি
জীবন-লহরী মম সুধু মরু-ময়—

আর ত সহে না প্রাণে
অরণ্যে রোদন গানে
বহিল যে আঁখি ধারা কে মুছাবে হায় !!

আমার কাঁদিবার উপযুক্ত স্থানই এই। যেখানে আত্মীয় বন্ধুর চক্ষেজল ঝরিবে না, কোন পাষাণ হৃদয়ের বিরক্তি জন্মিবে না, কেউ পাশে বসিয়া চখের জল মুছাইবে না, কেউ উপদেশ দিয়া এ আগুণ নিবাইতে চাহিবে না, কেউ দীন-নয়নে মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে না, এমন নীরব-নির্জ্জন স্থান ব্যতীত আর কোথায় কাঁদিব ? এ কান্না লোকালয়ে কাঁদিবার কান্না নয়, লোকালয়ে কাঁদিয়া ব্যথিতের প্রাণে ব্যথা দিব মাত্র, সুখীর আনন্দের কণ্টক হইব মাত্র, আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইব মাত্র—তাতে আর কায নাই।) জন্ম জন্মান্তরের শত সহস্র পাপের ফল, এবার ফলিয়াছে, এবার আবার মানুষকে কষ্ট দিয়া কায নাই। আমার বুকে আগুণ লাগিয়াছে, কেউ নিবা-

হইতে পারিবে না, বুকের ভিতর পুড়িয়া যাইতেছে, কেউ নিবাইতে পারিবে না তবে এ হৃদয় পুড়িয়া ছাই হউক্। তাই বা হয় কই?—কি আশ্চর্য্য! আগুণ পোড়ে, অথচ ছাই হয় না, ইহার কি কোন কারণ আছে? আছেই ত। এই যে পোড়া চোখের জল, ইহাই সর্ব্বনাশের গোড়া! ইহার জন্মেই পোড়া হৃদয় পুড়িতেছে মাত্র, ছাই হইতে পারে না! এই চোখের জল যদি না পড়িত, তবে এত দিন কোন কালে ছাই হইয়া যাইত।) তা আমি কি করিব? আমার অপরাধ কি? আমি দিব্য করিলাম, প্রতিজ্ঞা করিলাম মাকে কষ্ট দিব না, মায়ের সম্মুখে আর কাঁদিব না তা পালন করিতে পারিলাম কই? মন আমার কথা শুনে না—স্মৃতি আমার সঙ্গ ছাড়ে না—সেই জন্যে কান্না পর্য্যন্ত আমার বাধ্য নয়। মন আমার কথা শুনে না কেন? এ মন আমার নয়, আমি এক জনকে দিয়াছিলাম, এক জন ইহার অধিকারী হইয়াছি-

লেন, ইহাতে আমার কোন স্বত্ব ছিল না। সেই তিনি—যিনি এ মনের অধিকারী সেই তিনি সকল সম্পত্তি ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, সেই জন্যেই রাজাহীন রাজ্যের ন্যায় এ মনের এত দুরবস্থা হইয়াছে। মন প্রাণ হৃদয় কেহই আমার অধীনতা স্বীকার করে না—কেবল তাঁহার অভাবে এ দুরবস্থা ঘটিয়াছে!

তিনি যদি আমার এ কষ্টের মূল হন তবে আজিও তাঁর ভালবাসা-বন্ধন খসাইতে পারি না কেন ?—মরি, মরি, কি খসাইব ? কাহার ভালবাসা! যিনি ভালবাসার অবতার! যিনি আমার রোগে স্নেহময়, রাগে শান্তিময়, ভয়ে সাহসময়, বিপদে আশ্বাসময়, আশায় সুসারময়, কার্য্যে উৎসাহময়, দুঃখে প্রবোধ ময়, সুখে উৎসবময়, দোষে ক্ষমাময়, শিক্ষায় গাম্ভীর্য্যময়, মনের প্রফুল্লতা ময়, জীবনোদ্যানের বসন্তময়, অদৃষ্টের সৌভাগ্যময়, সংসারের বন্ধনময় কেবলই আমাময় কেবলই প্রণয়ময়

কেবলই তিনিময় হইয়া যিনি এ পৃথিবীতে আমাকে স্বর্গ দেখাইয়াছেন, যিনি আমাকে আচার্য্য হইয়া উপদেশ দিয়াছেন, শিক্ষক হইয়া শিক্ষা দিয়াছেন মাতা পুত্রের জন্যে যেরূপ চিন্তাকুলা, যিনি আমার জন্যে তদ্রূপ চিন্তা করিয়াছেন, যিনি বয়স্য হইয়া আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন, বন্ধু হইয়া মনের কথা বলিয়াছেন, মন্ত্রী হইয়া সৎ পরামর্শ দিয়াছেন, প্রভু হইয়া দোষের বিচার করিয়াছেন সেবক হইয়া সেবা করিয়াছেন, সহোদরের মত জীবনের সোদর হইয়াছেন, যিনি মুর্ত্তিমান প্রণয় হইয়া সোহাগ করিয়াছেন, যে দেবতা আমার মনুষ্য জীবনে অমরতা অনুভব করাইয়াছেন, আমি বলিতে জানি না যে কে হইয়া আমার কি করিয়াছেন, যিনি আমার চতুর্ব্বর্গ যিনি আমার যথাসর্ব্বস্ব, তাঁহার ভালবাসার বন্ধন খসাইব। ছুরি দিয়া বুক চিরিয়া ফেলি না কেন! যে মনে অমন ভাবনা আসিবে সে মনের মাথায় বজ্রাঘাত হউক না কেন!

এমনি সন্ধ্যাকালে—কতদিন আগে এমনি সন্ধ্যা-চন্দ্রমা গগণে হাঁসিয়াছিল, সেই হাঁসি সকল পৃথিবী গায় মাখিয়া ছিল, নদীর জলে সেই হাঁসির ছায়া পড়িয়াছিল, সেই হাঁসিতে তরুরগায়ে "রূপালি কাজ" হইয়াছিল, সেই হাঁসি লইয়া বায়ু জগৎ মাতাইয়াছিল, হাস্যমুখী লতাবধু কেমন নাচিয়া ছিল, সে কালের সেই সুখময়ী সন্ধ্যাকালে, একদিন প্রদীপের আলোকে একখানি পত্র পড়িয়াছিলাম, "অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, দেখিবার জন্যে মন বড় ব্যস্ত হইয়াছে * * * সবিশেষ পশ্চাতে লিখিব" এই সকল কথা যে পত্রে লেখা, সেই দিন সে দিন প্রথম পড়িয়াছিলাম—সেই সুখ সময়ে সেই মধুমাখা কথা কেমন মিষ্ট লাগিয়াছিল! সেই আনন্দে জগৎ আনন্দ করিয়াছিল,—কিন্তু হায়! সেই হইতে সে পত্র আর পাইলাম না! তেমন মিষ্ট কথা আর শুনিলাম না, সেই ব্যস্ততা আর নিবারণ হইল না—সে "পশ্চাতে" আর ঘটিল না—তবুও আমি মরিলাম না!।—

সে দিন গিয়াছে, সে কপাল গিয়াছে, সে সবই গিয়াছে কিন্তু সে কথাটী গেল না—সেই সুধা-মাখা কথা এখন কালসর্প হইয়া দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে আমাকে দংশন করিতেছে, বিষের জ্বালা সহিতে আর পারি না—পারি পারি তবু যেন আর পারি না! আমি যতই কেন যন্ত্রণা পাই না, এ প্রবাহ যতই কেন প্রবল হউক না, আমার সহিবার ক্ষমতা অবশ্য আছে। কাঁদিয়াই হউক, বকিয়াই হউক আর মর মর হইয়াই হউক, আমার কষ্ট আমি অবশ্য সহ্য করিতেছি। কিন্তু তিনি যে মনোকষ্টে গিয়াছেন, মনের কথা বলিতে পান নাই, মনের ব্যস্ততা নিবারণ হয় নাই, কোন আশা পূর্ণ হয় নাই, ইহা যে আমার বুকে আগুন হইয়া জ্বলিতেছে। এই কষ্টই আমার অসহনীয় হইয়াছে। আহা রে! না জানি কত কষ্টই পাইয়াছেন, সেই হাঁসিমাখা মুখ কতই মলিন হইয়াছে! আহা সেই হাঁসি! সেই সোহাগ জড়িত স্বপ্নমাখা হাঁসি। সেই

প্রেমের নবীনতাময় হাঁসি, সেই মন প্রাণ কেড়ে লওয়া হাসি, সেই যে আমায় পাগল করা হাঁসি, সেই হাঁসি যার, যাহার সেই হাঁসিমাখা মুখ, সে কি মরে? মৃত্যু কি সে মুখ বিকৃত করিতে পারে? ইহা স্বচক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না, তা লোকের কথা কেন বিশ্বাস করি? লোকে মিথ্যা কথা কয় ভাবি না কেন? দুর! তা কি বিশ্বাস্য! কেহ কি তাঁহাকে গালি দিতে পারে? তাঁহাকে সকলেই গোলাপ ভাবে ভাবিত, কেহই কণ্টক মনে করিত না। কেহ কি তাঁহাকে গালি দিতে পারে!

আমার কপালেই এমন হইল! আমাকে—এ হতভাগিনীকে যদি না গ্রহণ করিতেন তবে হয় ত স্বামী দীর্ঘায়ু হইয়া সচ্ছন্দে থাকিতেন! তা আমার ত অপরাধ নাই, এই কপাল সকল নষ্টের মূল!—এ পোড়া কপাল ঈশ্বরের কৃত বলিয়াই ত ঈশ্বরের উপর রাগ হয়, এ রাগ মানুষের উপর সাজে না বলিতেই ত ঈশ্বরের

উপর রাগ হয়। পরলোক আছে কি না জানিতে পাই না বলিয়াই ত ঈশ্বরের উপর রাগ হয়, ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে কি করেন, বুঝি না, বলেই ত ঈশ্বরের উপর রাগ হয়! সাধ করিয়া রাগ করি না। আমার বুকের ভিতর কিছুই নাই রে, যা ছিল তা কিছুই নাই। শূন্য স্থান কখনই থাকে না, শূন্য স্থানে বায়ু অধিকার করে; তা আমার বুকেও শূন্য স্থান যন্ত্রণায় অধিকার করিয়াছে। "পৃথিবীর কিছুই ধ্বংশ হয় না, এক বস্তু অন্য আকার ধারণ করে মাত্র" আমারও তাহাই হইয়াছে, হৃদয়-স্থিত সমস্ত বস্তু আগুণে পুড়িয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। সেই দিন, আমার সৌভাগ্য-প্রতিমার বিজয়ার দিন, সেই শ্মশানে যে চিতানল জ্বলিয়াছিল, আমার সর্ব্বস্ব ধনকে পোড়াইয়া আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব পোড়াইয়া সেই কালানল এ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, (সেই আগুণ আমার শূন্য হৃদয়পূর্ণ করিয়াছে)। সে আগুণে ধন মান আশা ভরসা

সৌভাগ্য সুখ সবই পুড়িয়া গিয়া কয়লা হই-হইয়াছে, এখন সেই কয়লাই জ্বলিতেছে। সেই দিন যে অশ্রুধারা পড়িয়াছে সে ধারা আর মিলাইবে না। ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান প্রভৃতি সবই সে স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তবুও বহিতেছে। স্মৃতির তরঙ্গ লইয়া কল্পনার ভরা লইয়া সে স্রোত প্রবাহিত হই-তেছে। সেই দিন যে দীর্ঘশ্বাস বহিয়াছে তাহা আর হ্রস্ব হইল না, সাধ শান্তি সুখ-স্বপ্ন প্রভৃতি যথা সর্ব্বস্ব উড়াইয়া ফেলিয়া সেই বায় আবার বহিতেছে। অতীতের নষ্টদ্রব্য, বর্ত্তমান অনল ও ভবিষ্যতের গরল লইয়া সুধুই, কার্ব্বণ্ বহিতেছে, কিছুই অক্‌সিজেনের সঞ্চার নাই!

ক্রমে রাত্র গভীর হইতে চলিল, এখানে কেমন করিয়া থাকিব। বনদেবি! আজি-কার মত বিদায় হইলাম, এরাত্রে যদি প্রভাত হয়, তবে আবার আসিয়া এ প্রসঙ্গ শুনাইব।

মনোসাধ মনে র'ল কাযে কিছু হ'ল না
পরাণের সব গেল পোড়া প্রাণ গেল না

একাদশী।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে মাত্র—জানালা দিয়া ঊষার আলোক গৃহে প্রবেশ করিতেছে। এখনও অনেকে শয্যায় আছেন; অপর গৃহে মানব-কণ্ঠ-স্বর শ্রুত হইতেছে: হেম জিজ্ঞাসা করিতেছে "পিসী মা! আজ কি তিথি?" পিসীমার বিষাদ সূচক স্বরে উত্তর হইল "মা আজ পোড়া একাদশী!" বাস্তবিকও আজ পোড়া একাদশী! যেদিন বঙ্গ-জননীর বিধবা কন্যাগণ ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃতপ্রায়া হইয়া জননী-অঙ্কে পতিতা হন আজ সেই পোড়া একাদশী। প্রাচীনা বিধবাগণ আজি কত কষ্ট পাইবেন! কত নব-বিধবা আজ এই কঠোর ব্রতে দীক্ষিতা হইবেন, যে কুসুম-সুকুমারী আতপ-তাপেই মলিন হইয়া পড়িয়াছেন, তিনিও প্রাণান্তে আজ, জল বিন্দু পান করিতে পাইবেন না—কেন না আজ পোড়া একাদশী! এ দৃশ্য কি হৃদয়-

ভেদী! এই সকল মর্ম্মন্তুদ কঠোরতাই "একাদশী" শব্দটী এতাধিক ভীষণ হইয়াছে! হেমের পিসীমা "পোড়া একাদশী" মাত্র বলিয়াছেন, কিন্তু পাত্রীও অবস্থা ভেদে এই একাদশীকে যমের যমজা-ভগ্নী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!

একাদশীকে যতই কঠোর মনে হউক না কেন, বোধ হয় একাদশীর ন্যায় বন্ধু বঙ্গ-বিধবার পক্ষে দুর্লভ। এই একাদশীতে সংসারাসক্তা পুত্র-পৌত্রবতী প্রাচীনা বিধবাগণও পতির প্রেমময় মূর্ত্তি মনে করিয়া চোখের জল ফেলিতেছেন, কত পাষাণ হৃদয়ও আজ বিগলিত হইতেছে, প্রিয় পতির প্রণয় চিহ্ন স্বরূপ বঙ্গীয় বিধবাগণ আজি একাদশী ব্রত করিতেছেন! এই একাদশীর ব্রত আমাদের পরম ব্রত, কে না বলিবে? এই বৈধব্য বেশই আমাদের স্বর্গীয় প্রেমের অভিজ্ঞান ও এই ব্রহ্মচর্য্যই আমাদের পতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও পতি পূজা। আমাদের বিবাহ অনন্ত সূত্রে গ্রথিত। আমাদের ভালবাসা ও প্রণয় চিরস্থায়ী। যিনি আমার

স্বামী, তিনি চিরকালই আমার স্বামী। চক্ষের উপরেই থাকুন, বা বহুদূরেই থাকুন, এ জগতে থাকুন কিম্বা পর-জগতে থাকুন, যেখানেই থাকুন তিনি আমারই স্বামী। যে দিন তাঁহার সহিত প্রথম সম্মিলিত হইয়াছিলাম, সেই দিন হইতে যেমন "এয়োত্ব" চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলাম ,আবার তাঁহার— আমার সৌভাগ্যের শেষ দিন হইতে এই এক বেশ ধারণ করিয়াছি। তাহাতেই ত বলিতেছি যে আমাদের সম্বন্ধ পার্থিব জগতে শেষ হয় না। তিনি স্বর্গে গিয়াছেন, মরা দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর কলেবর ধারণ করিয়াছেন, তাই আমি এ পবিত্র বেশ ধারণ করিতে ও এই পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইতে অধিকারিণী হইয়াছি। তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে না। "সম্বন্ধো জীবনাবধি—" এই বচনার্দ্ধ যদি হিন্দু-শাস্ত্র-সম্মত হয়, তবে সে এ ক্ষণিকজীবন নয়, সেই অনন্ত জীবন।

"বিধবা" কাহাকে বলে ? বিধবা শব্দের অর্থ

যদি পতিহীনা হয়, তবে আমরা দর্প করিয়া বলিব বঙ্গ মহিলা কখনও বিধবা হয় না। যদি কোন মহাসভায় যাইতে ক্ষমতা থাকিত, তবে এক জন জ্ঞানী মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিতাম যে, যে জাতির জীবন ক্ষণস্থায়ী, যে জাতির পরলোক নাই, ইহ জগতে উৎপত্তি ও ইহ জগতে লয় যাঁহাদের বিশ্বাস্য, পার্থিব মৃত্যু হইলেই যাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের সহিত অনন্ত বিচ্ছেদ হয় যে জাতীয় মহিলাগণ মৃত পতির— স্বর্গীয় পতির প্রণয় ভালবাসা সম্বন্ধ এমনকি স্মৃতি পর্য্যন্ত বিস্মৃতা হইয়া দ্বিতীয় স্বামী কর্ত্তৃক শূন্য হৃদয় পূর্ণ করেন. (পতি সত্বে) তাঁহারাই বিধবা? কিম্বা যে জাতির অনন্ত জীবন, অনন্ত সম্বন্ধ. অনন্ত ভালবাসা, অনন্ত প্রণয় এবং অনন্ত ঈশ্বরে যাহাদের বিশ্বাস, যাঁহাদের কুমারীগণ পার্থিব অপেক্ষা স্বর্গীয় সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিতে সক্ষম, ইহলোক অপেক্ষা পরলোকগত আত্মীয়কে যাহারা অধিক ভাল বাসিতে সক্ষম, যে অবলাদের পতি স্বর্গে গিয়াও প্রণয়িনীর জন্যে

অপেক্ষা করিতে বিমুখ নহেন, যাহাদের জীবনে মরণে সকল অবস্থায় সর্ব্বত্রেই স্বামী মাত্র অবলম্বন স্বামীর প্রণয়ই যাহাদের সর্ব্বস্ব ধন, সেই বাঙ্গালীর কন্যা বিধবা? বোধ হয় কেহই বলিবেন না বাঙ্গালীর মেয়ে কখন বিধবা হয়—তুমি যাই বল, আমি অবশ্য বলিব বাঙ্গালীর মেয়ে কখনই বিধবা হয় না। যে স্ত্রীর সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য বঙ্গাই পুরুষ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও কাতর নহেন, আর যে স্বামীর প্রণয় বঙ্গমহিলার জীবনের জীবনীশক্তি, অধিক কি যে সম্বন্ধে | জন্যে বঙ্গবাসীর সংসারাশ্রম, সেই প্রণয় সেই ভালবাসা, সেই সম্বন্ধ কিছুই নয়! সবই ইহজগতের জন্য? একবার মরিলেই সমস্ত শেষ হইল?—জাতি বিশেষে হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গালীর সেরূপ নহে, তাহাতেই বলিব যে বাঙ্গালীর মেয়ে বিধবা হয় না। অনিত্য ক্ষণস্থায়ী জীবন, নিত্য ও স্থায়ী জীবন পথে অগ্রসর হয় মাত্র, সাংসারিক ভোগ সুখ ঘুচিয়া ঐশ্বরিক সম্পত্তি লাভ মাত্র, পতি মনুষ্যদেহ ত্যাগ

করিয়া দেবতা হইয়াছেন মাত্র, আসল কথা, বাঙ্গালীর মেয়ে বিধবা হয় না!

তবে তিনি আছেন! হৃদয়! ক্ষান্ত হও পতি আমার আছেন! সেই ধর্ম্ম ভাব পূর্ণ আত্মা সেই প্রেমভাবপূর্ণ মন এবং সেই স্নেহভাব পূর্ণ হৃদয়, অবিকৃত রহিয়াছে। যখন এ নশ্বর দেহের ধ্বংস নাই, যখন পরমাণুর বিলয় নাই জগতের কিছুরই ধ্বংশ নাই, তবে কেন বল যে আত্মা নশ্বর! কেন বল যে আমার স্বামী মৃত?—আমি কখন বলিব না কখন ভাবিব না—কাণেও শুনিব না—তাঁহার অকল্যাণ হইবে তাঁহাকে গালি দেওয়া হইবে, ঈশ্বরের নামে কলঙ্ক হইবে, প্রণয়ের অবমাননা করা হইবে এবং আমার ভগ্ন হৃদয় খণ্ড খণ্ড হইবে! যে ক্ষুদ্র সেই মরে, যে নাস্তিক সেই মরে, যে পাপী সেই মরে এবং যাহার ভাল বাসিবার লোক নাই সেই মরে—আমার স্বামীকে—আমার অনন্ত জীবনের সর্ব্বস্বকে কেহ গালি দিও না, অবলার সম্বল কেহ কাড়িয়া ফেলিও না। "মৃত্যু" হইতে

ভয়ানক আর নাই কিন্তু সাধারণে যাহাকে মৃত্যু মনে করেন, তাহাত আমাদের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ। সে মৃত্যুইত আমাদের প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে উপস্থিত হইতেছে। মাতা মনে করিতেছেন পুত্র আজ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলেন, এই দুই বৎসর পুত্রের জীবন নহে, মৃত্যু সময়ের স্মৃতি মাত্র। এই জীবন মৃত্যুর ক্ষেত্র। আমাদের জগৎ মৃত্যুময়, আমরা মরণশীল, মৃত্যুই নিত্য সম্পত্তি—যে অজ্ঞান সেই মৃত্যুকে পর মনে করে, মৃত্যুই আমাদের আপনার জন। "মৃত্যু ঘটনা কি ভয়ানক ঘটনা!" যাঁহারা অমর তাঁহারাই উহা বলিলে শোভা পায়, আমরা—যাহারা প্রতি সময়ে মরিতেছি, সেই আমরা মৃত্যুকে ভয়ানক কিসে বলি? এই মরা জগৎ হইতে অপসৃত হইলেই আমাদের চির মরণ হইল না, কত জগতে কতবার মরিতে হইবে কোথায় বা মৃত্যুর শেষ হইবে কে জানে! আমাদের অনন্ত জগৎ অনন্ত জীবন এবং অনন্ত মৃত্যু।

এই দিন গেলে আর একদিন আসিবে, সেই দিনে আর এক জগতে যাইব। যে জগতে গেলে দুজনে একত্র হইব সেই জগতে যাইব; দুজনে—হরি! হরি! আমি আর কে? আমার ঐহিকের বন্ধন, পারত্রিকের স্বর্গ, মলিন হৃদয়ের পূণ্য জ্যোতিঃ ধর্ম্ম ভাবের বিশ্বাস, প্রণয়ের প্রিয়, মনের অটলোৎসাহ জীবনের সুখ, প্রিয়তমের সোহাগ, আবার তাঁহারই সঙ্গে মিলিতা হইব!—সে তিনিত এ জগতের পদার্থ নয়, স্বর্গীয় পদার্থ। ঈশ্বর আদর্শ স্বরূপ তাঁহাকে এ জগতে পাঠাইয়াছিলেন মাত্র। এ জগৎ তাঁহার থাকিবার স্থান নয়; যে জগতে অধর্ম্ম আছে, পাপ আছে, পরহিংসা আছে, পর পীড়ন আছে, নির্ম্মমতা আছে, অহঙ্কার আছে, স্বার্থপরতা আছে, কলহ আছে, শোক আছে, সন্তাপ আছে, জরা আছে, মৃত্যু আছে, অশেষ যন্ত্রণা ও অসীম দুঃখ আছে, সে তিনি সেরূপ জগতে থাকিবার পদার্থ নয়। তিনি স্বর্গীয় দেবতা স্বর্গই তাঁহার বাসোপযোগী স্থান, তাই ঈশ্বর

তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। আমরাও একদিন সেই দেশে যাইব, এই জীবনের অবসানেই সব হইবে!—এই অন্ধকারময় জীবন কবে অবসান হইবে? এ আগুণে কতদিন পুড়িয়া মরিব! এ জীবনের সবইত শেষ হইয়াছে এ জগতের স্বপ্নত ভাঙিয়া গিয়াছে, তবু বাঁচিয়া আছি কেন!

আমার দুদিনের খেলা দুদিনেই ফুরাইল! এ জনমের মত এ জনমের কিস্তি খেলাপ হইয়া গিয়াছে। শোকের সহিত দুঃখের সহিত অবিচ্ছেদ সখ্যতা জন্মিয়াছে। নৈরাশ্যের করাল মূর্ত্তি অনবরত চোখের উপর প্রতীয়মান হইতেছে! যাঁহারা বলেন "আশা দুঃখের কারণ, নৈরাশ্যই সুখকর" তাঁহারা দেবতা বা দেবানুগৃহীত সন্দেহ নাই। হতভাগা বঙ্গ মহিলার মনে সে দৈবীশক্তি কোথায়? চির দিন যেন আশা করিতে পাই—আশা পূর্ণ হইতে যতই বিলম্ব হউক না কেন, নৈরাশ্যের সঙ্গে যেন এক দিনও দেখা না হয়! আশার স্নেহমাখা কোলে, মাথা

রাখিয়া সেই মধুময় কথা শুনিতে শুনিতে যেন অনন্ত ঘুম ঘুমাইতে পারি—যিনি পারেন তিনিই সুখী! যিনি অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া প্রেম-ময় পতির সজল নেত্র দেখিয়া চক্ষু মুদিতা করেন, আমি ভাবি তিনিই ভাগ্যবতী—এ জগতে তিনিই ভাগ্যবতী! আমার মরণেও আর গৌরব নাই—মৃত্যু কালেও "ভাগ্যধরী" উপাধি পাইব না। প্রণামান্তে গুরুজন আর "সাবিত্রী সমানা হও" আশীর্ব্বাদ করিবেন না। অক-ল্যাণের ভয়ে কেহ কোন ভাগ্যবতীর সঙ্গে আমার উপমা দিবে না! আমার এ নিশি আর প্রভাত হইবে না, এ আঁধারে আর আলো জ্বলিবে না, আর সে বুকে মুখ লুকাইয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিব না, ঘুমের ঘোরে সে মুখ দেখিয়া হৃদয়-প্রবাহে আর সুখের ঢেউ উঠিবে না, এ আঁধারে আর আলো জ্বলিবে না!

এ প্রসঙ্গ বলিতে গেলে হইবে না, কাঁদিতে ফুরাইবে না, লিখিতে ধরিবে না! যে হারাণো প্রণয় চিরজীবন বলিয়া কাঁদিয়া বা লিখিয়া শেষ

হইবে না, তাহা শেষ করিতে এ ক্ষুদ্র প্রিয় প্রসঙ্গের সাধ্য কি !

সাবাসি প্রণয় ! তোরে বলিহারি যাই !
তোমা হ'তে জ্বালা আর ধরাতলে নাই !!

সম্পূর্ণ।